X. January 1931 No. 2

ASUTOSH COLLEGE MAGAZINE

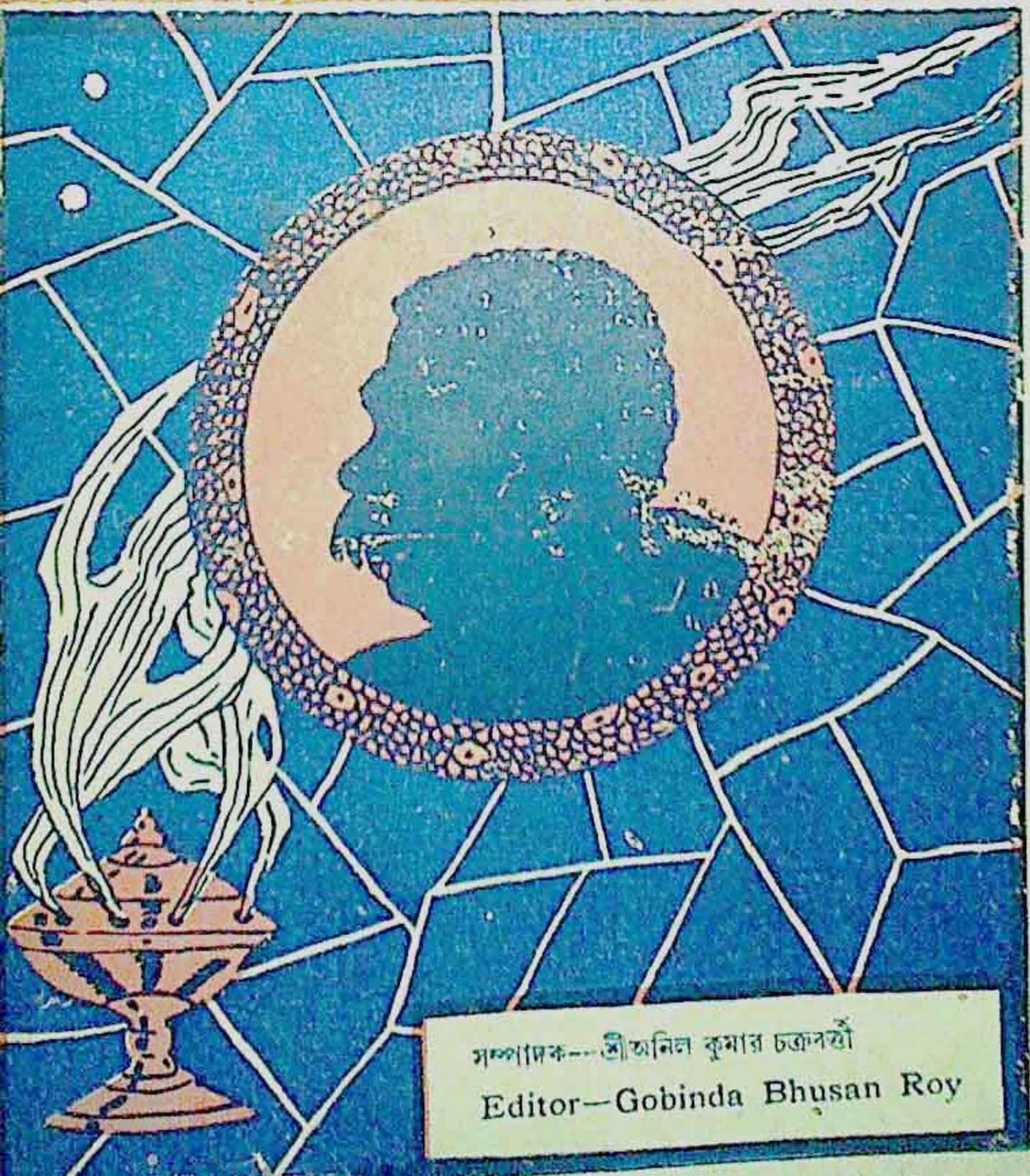

সম্পাদক—শ্রীঅনিল কুমার চক্রবর্ত্তী
Editor—Gobinda Bhusan Roy

499

EDITORS

1924 — Prof. Mohinimohan Mukherji, M. A.
1925 — Basudev Banerji
1926 — Bibhas Rai Chaudhuri, S. Raghavachari
1927 — Subodh Biswas, Dhiren Lahiri, Satiranjan Banerjee
1928 — Sashibusan Barik, Kalyankumar Sen Gupta
1929 — Asok Kumar Banerjee, Shymapada Mukherjee
1930 — Kausik Kumar Mitra, Provat Kumar Bose
1931 — Shyamapada Mukherjee, Profulla Kumar Sarkar
1932 — Batto Kristo Banerjee, Amiya Ratan Mukherjee, Bireswar Chatterji
1933 — Hariprasanna Chakravartty

Annual Subscription in India including postage: Rs. 2-4-0
Foreign: 4 shillings. For ex-students of Asutosh College: Rs 1-8-0

Professor-in-charge Pro B. GHOSHAL M.A B.L.

ASUTOSH COLLEGE ESTD. 1916 LIBRARY

সূচীপত্র ।

১।	রামমোহন (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষাল	১
২।	মরণ রে !	শ্রীপ্রফুল্ল সরকার	২
৩।	ভারতের নারী ও তাহার কর্মক্ষেত্র	শ্রীকল্যাণী দেবী	১২
৪।	দূরে আছ তাই নিতি বাজে গীতি (কবিতা)	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	১৪
৫।	সাহিত্য, সাহিত্যিক ও পাঠক	শ্রীনৃসিংহ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	১৭
৬।	ভগবান বিরাট্	শ্রীমালতী সোম	১৯
৭।	জাতি গঠনে স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রীঅমূল্য কুমার মুখোপাধ্যায়	২১
৮।	ফ্যাসিষ্ট ইটালীর তরুণদল	শ্রীকালী চরণ দাস	২৪
৯।	মল্লিকা মধুকরম্	গুণমণি দাস	২৭
১০।	এক নম্বর	শ্রী............দেবী	৩০
১১।	ঋতু ও রাখাল	শ্রীঅনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২
১২।	অন্তরতম (কবিতা)	শ্রীশ্যামলেন্দু মজুমদার	৩৪
১৩।	কয়েকটি কথা	শ্রীগোবিন্দ রায়	৩৫
১৪।	কল্পে (কবিতা)	শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী	৩৯
১৫।	যৌবন-মূর্ত্তি রামমোহন	শ্রীঅমিয় রতন মুখোপাধ্যায়	৪১
১৬।	করুণাময় (কবিতা)	শ্রীরাখাল গুরুদাস রায়	৪৮
১৭।	কাব্য-কথা:—		
	'কী প্রলাপ কহে কবি—'	"নীলকুমার"	৪৯
	প্রয়াস	শ্রীকমলেন্দু মজুমদার	৫১
	শিল্পীর সাধনা	শ্রীনীলরতন দত্ত	৫১
	কবি	শ্রীজ্যোতির্ম্ময় মৌলিক	৫২
১৮।	মর্ম্ম-উৎপ্রাস	অ. কু. চ.	৫৩
১৯।	যুদ্ধচিন্তা-প্রবোধ-প্রেম সাহিত্য	সম্পাদক	৫৪
২০।	সম্পাদকীয়		৫৮

CONTENTS

1.	A Face ...	Jotish Chandra Kundu	1
2.	The Bengali Neo-Romantics	Prof. Mohini Mohon Mukherji	2
3.	The Cogitations of an Aged Man	Miss Bani Ray	6
4.	The Birth of Dramatic Literature	Jyotirmay Ganguly	9
5.	Reserve Bank of India	Gobinda Ray	12
6.	A Child	Rani Maitra	14
7.	Matthew Arnold	K. N. Daniel Muthlaly	15
8.	The Next War	Kamala kanta Bhattacharjee	18
9.	The Life of the Nation	Sachidananda Sinha	20
10.	Sir Jagadish Chandra Bose	Nikhil Ranjan Banerjee	24
11.	Odds and Ends	Prof. B. B. Ghoshal	28
12.	From the General Secretary's Desk	Sukesh Banerjee	35
13.	Review	Prof. Mohini Mohon Mukerjee	36 (a)
14.	The Book World	Prof. Bibhuti Bhushan Ghoshal	36 (b)
15.	Editorial		37

আশুতোষ কলেজ ম্যাগাজিন

দশম বর্ষ | মাঘ, ১৩৪০ | ২য় সংখ্যা

রামমোহন

অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল

ধর্ম্মের খোলস পরি' ভণ্ড যত করেছিল ভিড় ;
ক্রূরসর্প চুপি-সারে পশেছিল বিহঙ্গের নীড়;
আচার কঙ্কালটারে বাহু মেলি' ধরে ছিল সবে;
পূতি-গন্ধ শবে পূজি' ছিল মত্ত শ্মশান-উৎসবে;
নারী-হত্যা মহাপাপ পুণ্য বলি' গণ্য হোত দেশে;
বেদেরে বিদায় দিল অর্থহীন স্মৃতি-শাস্ত্র এসে;
মানব ধর্ম্মের চেয়ে মনুধর্ম্ম পূজা পেল' যবে;
প্রেম-মন্ত্র মগ্ন হোল প্রলয়ের নৃশংস-ভৈরবে।

সেই মহা সন্ধিক্ষণে জাতিরে বাঁচালে তুমি, বীর '
কূপ-মণ্ডুকেরে দিলে নব শুভ আলোক-সমীর।
হিন্দুরে বুঝায়ে দিলে, তা'র ধর্ম্ম কত মহীয়ান্—
'সত্য-শিব-সুন্দরের' পেল' তারা আবার সন্ধান।
মুহ্যমান এ জাতিরে যাদুস্পর্শে করি' সঞ্জীবিত—
রাখিলে অমর কীর্ত্তি,—সারা বিশ্ব আজিও বিস্মিত।

মরণ রে !

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার (চতুর্থ বর্ষ,কলা)

সারাদিনের পর শিবরাম মুড়িগুলি গোগ্রাসে গিলিতেছিল।

গোটা দুইটি দিন এবং রাত মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, একটি টুকরা বলিতে শিবরামের পেটে যায় নাই; হতভাগা ছেলেগুলার জ্বালায় তাই কি কিছু খাইবার যো আছে। কালও শিবরাম ঠিক্ এম্‌নি সময় কিছু মুড়ি যোগাড় করিয়াছিল। ছেলেগুলা যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে, চক্ষের পলকে চারজনে মিলিয়া কাড়িয়া ছিঁড়িয়া সব লইয়া গেল; একটি কণাও তাহাকে খাইতে দেয় নাই। ছেলেগুলা সারাদিন চাহিয়া চিন্তিয়া একরূপ যাহা হ'ক খাইতে পায়, তবুও হতভাগারা ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের মত সব সময় যেন জিভ বাহির করিয়া ঘুরিতেছে; পাইলে বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র খাদ্য-পানীয় এক মুহূর্ত্তেই গিলিয়া ওগরিয়া শেষ করিয়া ফেলিবে।

আজ যাহা হউক, শিবরাম কিছু চাউল পাইয়াছে; ওপাড়ার একটি বিধবা মেয়ে দয়া করিয়া কয়টি মুড়ি ও দুটি পয়সা দিয়াছে। চাউলগুলি ভুতো পুঁটেদের রাঁধিয়া দিতে হইবে। বাকী কিছু থাকিলে না হয় সেও দুটা খাইয়া লইবে। এক পয়সার সাবু কুসুমকে ফুটাইয়া দিলেই চলিবে; আর এক পয়সায় খানিকটা কেরোসিন সে আজ কিনিয়া আনিবেই। শৈলি মরিয়া যাইবার পর হইতে প্রত্যহ আশে পাশে কাহাকে যেন ঘুরিতে দেখা যায়। মেয়েটি ঘর ছাড়িয়া যায় নাই। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় শিবরাম ঠিক দেখিয়াছে স্পষ্ট যেন শৈলির মত কে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে মনে হয় সে যেন এদিক ওদিক চলা-ফেরা করিতেছে। আলোয় সে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিবে।

শিবরাম কিন্তু আজ সটান বাড়ী যায় নাই। চালুতাতলার পুকুরপাড়ে একটি কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া মুড়িগুলি খাইয়া লইতেছিল, জল খাইয়া খানিক জিরাইয়া ফিরিলেই চলিবে'খন। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই; সবে বিকাল। শিবরাম দেখিল কাহাদের একটি ছোট ফুটফুটে কন্যা মত মেয়ে হাতে কয়েকটা থালাবাসন লইয়া ইট-বাঁধানো সিঁড়ি বাহিয়া তরতর করিয়া জলে নামিয়া গেল। নাকাইয়া কাকাইয়া চলিবার সময় তাহার কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলানো কালো কোঁকড়ানো চুলের গোকাগুলি তালে তালে দুলিতেছে। শিবরাম খানিক পরে আবার চাহিয়া দেখে কখন মেয়েটির বাসনগুলি সব মাজা হইয়া গিয়াছে। দু'হাতে ধুইয়া সেগুলি সে সিঁড়ির উপর সাজাইয়া রাখিতেছে। মেয়েটি এইবার গলা উঁচু করিয়া উপরের দিকে কি একবার দেখিয়া লইল। তারপর আস্তে আস্তে জলে নামিয়া ছোট ছোট হাত পা ফেলাইয়া দুলাইয়া জলের উপর ভাসিয়া চলিল। এতটুকু মেয়ে এম্‌নি সাঁতার শিখিয়াছে; শিবরাম খাওয়া ভুলিয়া কৌতুক-ভরা চোখে তাকাইয়া রহিল। শৈলিও বেশ সাঁতার

"সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগি নি।"—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য (৩য় বর্ষ বিজ্ঞান)

জানিত। মেয়েটি একেবারে মাঝখানে চলিয়া গিয়াছে—এইবারে বাঁ দিকে ঘুরিতেছে; শিবরাম এতক্ষণে বুঝিয়াছে; ওধারে একরাশ কলমি শুষনি দামের চারপাশে একঝাঁক সাদা সাদা শালুক সাঁপ্‌লা ফুটিয়া আছে। মেয়েটি ফুল তুলিবে। কালো তক্‌তকে জলের তলায় মেয়েটির রাঙা রাঙা চঞ্চল হাত-পাগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। শিবরাম চাহিয়া দেখিল আর একটি মাঝবয়সী লক্ষ্মী-প্রতিমার মত মেয়ে পুকুরঘাটে আসিতেছে। হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বেশ উঁচু গলায় বলিয়া উঠিলেন—ও পোড়ারমুখী, এই হ'চ্ছে তোমার, আমি বলি দেরী হয় কেন! কি দস্যি মেয়ে গো, একটু ভয় ডর বুকে নেই; সন্ধ্যেবেলায় তুমি একেবারে মাঝ মধ্যিখানে গিয়েছ! বের্ বের্ বল্‌চি, পোড়ারমুখী! বলিতে বলিতে তিনি একেবারে নীচের সিঁড়ির উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বোধ হয় মেয়েটির মা।

মেয়েটির আর ফুল তোলা হইল না। ঘাটের কিছুদূরে আসিয়া জলের উপর শঙ্কিত মুখে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—এখনও উঠ্‌লি না, কি ক'র্‌বো গো মা এ দস্যি মেয়ের সঙ্গে; উঠে আয় না!—বলিয়া প্রবলভাবে তিনি হাতটি আন্দোলিত করিলেন।

ছোট মেয়েটি ঠোঁট ফুলাইয়া এইবার ভয়ে ভয়ে বলিল—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার ভয় করে না বুঝি!—চোখ তাহার ছলছল করিতেছে।

—ভয়ে তুমি একেবারে দড়ি হ'য়ে গেচ, না! মেয়ের আমার ভয় ক'চ্চে, রঙ্গ দেখে বাঁচিনে। বলিয়া মেয়েটির মা উদ্গত হাসি চাপিতে চাপিতে মাজা বাসনগুলি হাতে তুলিয়া লইলেন।—এই আমি চল্লুম—এক্ষুনি উঠে আয়, আসুন আগে উনি, তোমার হবে'খন! বলিতে বলিতে মা চলিয়া গেলেন।

মেয়েটি এইবার আস্তে আস্তে উঠিয়া উপরপানে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া লইল। তারপর ছোট ছোট দুই হাতে মুঠা করিয়া পায়ের দিকের কাপড়টা নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে লাফাইয়া লাফাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। যাইবার সময় বড় বড় চঞ্চল দুটি চোখ তুলিয়া শিবরামের পানে একবার তাকাইয়া হঠাৎ কেমন একরকম ঘাড় ফিরাইয়া লজ্জায় চোখ বুজাইয়া তীরের মত দৌড়াইয়া একেবারে দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল!

শৈলিও এম্‌নি চঞ্চল ছিল! শিবরামের চোখে একটা কাঁকর উড়িয়া আসে বুঝি!

পুকুরের ওপার দিয়া রাঙামাটির বড় একটি রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া বরাবর ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গিয়াছে। তাহারই উপর দিয়া বড় একটা মোটরবাস সশব্দে পার হইয়া গেল। এখানেও কিছুদিন হইল শহর হইতে মোটর বাসটার আমদানী হইয়াছে। সোজা ষ্টেশন হইতে বরাবর চাপাহাটা হইয়া শহরে লোক লইয়া যায়, আবার ষ্টেশনেও ফেরৎ ধরাইয়া দেয়; দিনে চার পাঁচবার যাতায়াত করে।

শিবরামের ছেলেগুলার জন্যই যা একটু ভাবনা; যা দুরন্ত! মোটর গাড়ী হাওয়ার মত ছোটে, কি মোটা চাকাগুলি! কত ভারী তার কি ঠিক আছে! ইহার সাম্‌নে পড়িলে কি রক্ষা রহিবে; বাছাধনেরা উঠিয়া আর পথ্য করিতে হইবে না। ভূতোটা ভারি বেয়াড়া হইয়াছে, খুটোটাও কম যায় না; হতভাগারা সব সমান। কোথায় যে টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এখনই রাজ্যের ক্ষুধা লইয়া ফিরিবে।

মুড়িগুলি ফুরাইয়া আসিয়াছে; এইবার শিবরাম উঠিবে। এখনই হয়ত' অন্ধকার হইয়া আসিবে। আকাশে কালো কালো মেঘ জমিতেছে। সারাদিন না' শুমোট গিয়াছে। বৃষ্টিও আসিতে পারে। কুসুম রোগা মানুষ, সারাটা দিন আজ কিছুই তাহার পেটে পড়িল না। কে জানে কুসুম কেমন আছে!

শিবরাম তাড়াতাড়ি শেষগালটি গালে দিয়া আঁচ-চিবানো করিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে ভূতোর গলা শোনা গেল—ওরে লুকিয়ে লুকিয়ে বাবা কি খাচ্ছে রে! সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে ছেলের দল আসিয়া শিবরামের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুড়িগুলি আর তাহার গিলিয়া ফেলিবার সময় হইল না। অস্থিপঞ্জরসার উলঙ্গ ছেলেগুলা শিবরামের পরণের শতচ্ছিন্ন কাপড়খানি আঁতিপাঁতি করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে তীব্র ক্ষুধার্তস্বরে মর্মভেদী চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে। সহসা চাউলের পোটলাটি আবিষ্কার করিয়া ভূতো দুর্জয় আনন্দে রোগা টিকটিকে গলা দিয়া এমনি উচ্চস্বর বাহির করিল, মনে হইল, এখনই যেন উল্লাসের আতিশয্যে তাহার দুর্বল হৃৎপিণ্ডটি শতখান্ হইয়া কাটিয়া পড়িবে।

শিবরাম ভূতোকে ঠেকাইতে ঠেকাইতে বিব্রত হইয়া কহিল— দেখ দেখি একবার কাণ্ড, এতে চাল রে বাবা চাল; টানিস্‌নি টানিস্‌নি ভূতো, সব প'ড়ে ছড়িয়ে একেক্কার হ'য়ে যাবে।

ভূতো নিরুপায় নিষ্ফল ক্রোধে শিবরামের লম্বা চুলগুলি দুই হাতে মুঠা করিয়া টানিতে টানিতে দুর্বল ক্ষীণ নাকী স্বরে প্রবল কান্না জুড়িয়া দিল—লুকিয়ে লুকিয়ে তুই খেলি কেন, সারাদিন কিচ্ছু খাইনি, খিদে পায় না! রোজ রোজ তুই লুকিয়ে লুকিয়ে খাবি! ভূতোর নিষ্প্রভ চোখ দুইটি সারাদিনের সঞ্চিত ক্ষুধার আগুনে অসহ্য জ্বালায় জ্বলিতেছিল। তলায় শিবরামের কাপড়ের ফাঁক দিয়া মাটিতে কয়েকটি মুড়ি বুঝি পড়িয়া গিয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া খাইবার জন্য পুঁটে কেলো খুটো তিনজনে একসঙ্গে সে কী প্রাণপণ ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি জুড়িয়া দিয়াছে।

হঠাৎ বিপুল আর্তনাদ করিয়া পাগলের মত শিবরাম ভূতোকে ঠেলিয়া দিল। ভূতো টাল সামলাইতে পারিল না; গড়াইতে গড়াইতে পড়িল গিয়া একেবারে পুকুরের খোলে। শিবরামের একগোছা চুল উপড়াইয়া তখনও ভূতোর হাতে মুঠা করিয়া ধরা!

খুটো, কেলো, পুঁটে, তাহাদের প্রচণ্ড সংগ্রাম থামাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-ভেদী চীৎকার করিয়া উঠিল। শিবরাম ইহা ভাবে নাই; নিমিষের মধ্যে জলে নামিয়া ভূতোকে দুইহাতে বুকে করিয়া সাপটিয়া তুলিয়া লইল। ভূতোর কপালের বাঁ দিকটা ছুঁচলো একটা বাঁশের

গরদানে কাটিয়া ফাঁক হইয়া গেছে। লাল ডগ্‌ডগে তাজা রক্তে চোখ মুখ ভাসিয়া যাইতেছে। টস্‌ টস্‌ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত জলের উপর অবিশ্রাম গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কঙ্কালসার এতটুকু ছেলেটার এই অতি অপুষ্ট দেহে এত রক্ত কোথা হইতে আসিল! শিবরামের সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতেছে। ভুতো নিঝুম মারিয়া গিয়াছে। নড়েও না, কাঁদেও না; শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মত চোখ চাহিয়া পড়িয়া আছে।

শিবরাম সিঁড়ি বাহিয়া জলে নামিয়া গেল। ভুতোর শিথিল দেহটা কোলের উপর শোয়াইয়া চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল। কেলো হুটোর চোখ ছলছল করিয়া উঠিয়াছে। পুঁটে কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। বহুক্ষণ পরে রক্ত যেন কেমন একটু থামিয়া আসিল। ভুতো যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করিয়া বোধ হয় কাঁদিতে গেল—কিন্তু কান্না বাহির হইল না, শুধু ঠোঁট দুইটা ঈষৎ ফাঁক হইয়া মুখটা হাঁ হইয়া গেল। শিবরাম এক আঁজলা জল তাহার মুখে ঢালিয়া দিল, সবটুকু ভুতো নিঃশেষে শুষিয়া লয়।

ভুতোর অনাবৃত সারাটা গায়ে রক্ত গড়াইয়া গিয়াছে; শিবরাম সেগুলি জল দিয়া এইবার ধুইয়া দিবে। হঠাৎ সে চমকাইয়া উঠিল। বেত দিয়া আঘাত করিলে যেমন সোজা সরল সরু রক্ত-জমানো তামাটে দাগ চামড়া কাটিয়া বসিয়া যায় তেম্‌নি কয়েকটা নিষ্ঠুর আঘাতের চিহ্ন ভুতোর সারা পিঠে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিলে বোঝা যায় আঘাতগুলি আজিকারই; জল লাগিয়া বোধ হয় জ্বালা করিতেছে, ভুতো যন্ত্রণায় পিঠ কোঁচকাইয়া কুকড়াইয়া আনে।

গভীর বেদনার্ত্তস্বরে শিবরাম শুধায়—হুটো, ভুতোকে এমন ক'রে কে মেরেছে রে?

তারপর একে একে যে অমানুষিক নৃশংস নিষ্ঠুরতার কাহিনী হুটোর ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে বাহির হয়, মনে হয়, তাহার প্রতিটি অক্ষর যেন তীক্ষ্ণ শাণিত শলাকার মত শিবরামের দুর্ব্বল পঞ্জরাস্থি ভেদ করিয়া বুকের মধ্যখানে গিঁথিয়া গিঁথিয়া বসিতেছে।

স্থানীয় ঠাকুরবাড়ীতে রোজকার মত হুটো কেলো পুঁটে তিনজনেই প্রসাদ পাইয়াছে। ভুতোটা ঠিক সময় হাজির হইতে পারে নাই, ঠাকুরবাড়ীতে খাওয়াও আর জুটে নাই! দ্বিপ্রহরে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া ষ্টেশনের ধারে শহর হইতে যে নূতন খাবারের দোকান আসিয়াছে সেখান হইতে বুঝি কি তুলিয়া লইয়াছিল। তাহারা শহরের লোক; বেদম প্রহার করিয়া অবুঝ এই শিশু ছেলেটিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

কেলো ভুতোর হাত দুটা উঁচু করিয়া তুলিয়া শিবরামকে দেখাইয়া বলিল—এই দেখ্‌ বাবা, লোকগুলো ভুতোকে হাত মুচ্‌ড়ে এম্‌নি বেঁধেছিল—দড়ি একেবারে কেটে কেটে ব'সে গেছে; বলিয়া তাহার সশঙ্ক কালো চোখ দুটি তুলিয়া শিবরামের পানে তাকাইল।

শিবরাম কেমন যেন হইয়া গিয়াছে। কোলের উপর ভুতোর উলঙ্গ বিশীর্ণ শিথিল দেহটা পড়িয়া আছে। শিবরাম একদৃষ্টে চাহিয়া দেখে ভুতোর পেটটা ঢুকিয়া পিঠের সঙ্গে ঠেকিয়াছে। মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। শিবরাম বহুদিন ভুতোকে এম্‌নি করিয়া দেখে নাই;

আজ যেন মনে হইল ভুতো অনেক রোগা হইয়া গিয়াছে, কতদিনের অতৃপ্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অসহ্য প্রখর আগুনে কচি দেহটি ঝলসিয়া গিয়াছে। অঙ্গার পুড়িয়া ছাই হইবার আগেই নিভিয়া গেলে যেমন কালো কর্কশ বিবর্ণতায় পরিণত হয়, সারা অঙ্গময় তাহার তেম্‌নি কালিতে কালিতে লেপিয়া গিয়াছে। পুড়িতে পুড়িতে একদিন ছাই হইয়া গেলেই সব শেষ হইয়া যাইবে।

মহন্ত উনানের আগুনে খানিকটা জায়গা অল্প আলোকিত হইয়া আছে। তাহারই মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখা যায় শিবরাম দুই হাঁটুর মধ্যে মাথাটি গুঁজিয়া বসিয়া রহিয়াছে। বাহিরে আর কোথাও আলোর চিহ্নটুকু নাই। শিবরামের ঠিক পিছনে নীচু দেয়ালের গায়ে গায়ে বাঁশ ঘেঁসিয়া আরও অনুচ্চ অপ্রশস্ত একটা দুয়ার ফুটানো হইয়াছে বোধ হয়; তাহারই জীর্ণ আবরণের অসংখ্য ছিদ্র দিয়া ভিতরের অতি ক্ষীণ অনুজ্জ্বল আলোর রেখা দেখা যায়। সাম্‌নে খোলা মাঠের উপর পিটুলি গাছটার তলা দিয়া কি যেন অস্থির হইয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছে। শুক্‌না পাতায় তাহারই খস্‌খস্ আওয়াজ শোনা যায়।

শিবরাম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্ধকারেও তাহার চক্ষু চলে, ইহা যেন অভ্যাসেরই সামিল হইয়া গিয়াছে। উনানের পাশ হইতে একটি ছোট বাটি উঠাইয়া লইয়া আগড় ঠেলিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

নিষ্করুণ দারিদ্র্য ও জীর্ণ জীবন কেরোসিনের নিষ্প্রভ ধূমায়িত আলোয় বেশ মানায়; আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

সেই অনুচ্চ অপরিসর ঘরটার একপাশে ভিজা স্যাঁৎসেতে মাটির উপর চট ও দুর্গন্ধ ময়লা কাপড় দিয়া সারিবন্দী বিছানা মত করা হইয়াছে। তাহারই একধারে জীর্ণ শয্যায় ততোধিক জীর্ণদেহ একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিলে তবে চেনা যায় যে এ কুসুম! রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া চুলগুলি সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের কঙ্কালগুলি এম্‌নি স্পষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে যে তাহাকে জীবিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। তাহারই ঠিক পাশে নগ্নগায়ে ক্ষুধাক্লিষ্ট ছেলেগুলি অঘোরে ঘুমাইতেছে।

শিবরাম কুসুমের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আস্তে আস্তে ডাকিল—শৈলির মা, সাবুটা খেয়ে নে, রাত হয়ে গেছে।

কুসুম চাহিয়াই ছিল। আজকাল কুসুমের এম্‌নিই হয়; সময় সময় সে বেশ কথা কয়, খাইতে চাহে, ছেলেদের পাশে শোয়াইয়া আদর করে; কিন্তু মেয়েটা মরিয়া যাইবার পর হইতে মাঝে মাঝে কেমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া লক্ষ্যহীনভাবে চাহিয়া থাকে, ডাকিলে বুঝিতে পারে না; সাড়া ও দেয় না। কুসুম হয়ত' আর বেশীদিন বাঁচিবে না!

শিবরাম আবার ডাকে—কুসুম, ও কুসুম, সাবুটা খেয়ে নে! এইবার কুসুম বুঝিতে পারে,

উদাস ভাবে কিছুক্ষণ শিবরামের পানে চাহিয়া থাকিয়া, তারপর হাত বাড়াইয়া ভুতোকে দেখাইয়া দেয়।

ভুতোর কপাল দিয়া এখনও অল্প অল্প রক্ত ঝরিতেছে। শিবরাম বাঁধনটা খুলিয়া দিয়াছে। ছেলে জ্বরে একেবারে বেহুঁস অচৈতন্য; শিবরাম সেই যে সন্ধ্যায় আসিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া আসিয়াছে, তারপর আর সে চোখ ও চাহে নাই—কথা ও বলে নাই। রাতটুকু কাটিয়া যাক্, শিবরাম ভুতোকে বাঁচাইবে যেমন করিয়া হ'ক।

কুসুমকে সাবুটুকু খাওয়াইয়া তাহার গায়ের কাপড়টা সে ভাল করিয়া টানিয়া পা দুটা ঢাকা দিয়া দিল।

কেরোসিনের টেমিটার মুখে কালো কালো ভুষা তাল পাকাইয়া জমিয়া প্রচুর ধোঁয়া উঠিতেছিল। শিবরাম একটা কাঠি দিয়া সেগুলি ঝরাইয়া দিল।

এইবার ছেলেগুলাকে জাগাইতে হইবে। পুঁটেটা ছেলে মানুষ; ক্ষুধায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চোখের কোলে এখনও জলের দাগ শুকাইয়া আছে। ঘুটোর শোয়া যা খারাপ, একেবারে ভুতোর গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। কাল হইতে ঘুটোকে একেবারে একধারে শোয়াইয়া দিতে হইবে। শিবরাম আর দেরী করিবে না; ছেলেরা সারাদিনের ক্ষুধা লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের ডাকিয়া খাওয়াইতে হইবে। ভাত আজ পর্যাপ্ত হইয়াছে, শিবরামের ও কুলাইবে। ছেলেগুলা বহুদিন পরে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে। তাই বলিয়া এখনই সে ইহাদের ডাকিতেছে না; ছেলেগুলার যা ঘুম, ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলেও উঠিতে চাহিবে না। ঘুটোর ঘুম ভাঙানো সে একরূপ দুষ্কর বলিলেই হয়। শিবরাম ইহাদের লইয়া কম জ্বালাতন হয়? ঘুটোটার পেট পড়িয়া আছে। কখন ছেলেমানুষ সেই সকালে দুটি খাইয়াছে, কিন্তু এখন তুমি একক্রোশ দূরে ইহাকে বহিয়া লইয়া যাও—মাঠের মধ্যে শোওয়াইয়া দিয়া এস, তবু কেমন ইহার ঘুম ভাঙ্গে! এত ক্ষুধা লইয়া ঘুটোটা এমন ঘুমায় কি করিয়া! শিবরামের ভারি আশ্চর্য্য লাগে।

ঘরের মধ্যে আগে সব গুছাইয়া তুলিয়া আসুক, তারপর ছেলেদের সে ডাকিবে। সন্ধ্যা-বেলায় বাঁড়ুজ্যেদের মজা-দীঘিটা হইতে একজোড়া পদ্মপাতা শিবরাম তুলিয়া আনিয়াছে। একটাতে ঘুটো আর পুঁটে; সে আর কেলো বাপবেটায় মিলিয়া এইখানে এইটাতে বসিবে। শিবরাম পাতা বিছাইয়া দেয়। শিবরামের বড় দুঃখ ভুতোকে আজ দুটা খাওয়াইতে পারিল না। ভুতোর গায়ে হাত দিয়া দেখে সারা গা জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। আজ আর ভুতোকে ডাকিয়া কাজ নাই।

শিবরামের শৈলির কথা মনে পড়ে; শৈলি ইহাদের মত এমন ঘুমাইত না; উনানের পাশটিতে বসিয়া শিবরামের সহিত কত কথা, কত গল্প বলিত। ফুটন্ত ভাতের দিকে কেমন একরকম হাসি হাসি ভাবে চাহিয়া থাকিত। খাওয়ার সময় শৈলির সে কি আমোদ! সে থাকিলে

এতক্ষণে আজ শিবরামকে ধমকাইয়া হাসাইয়া কালাপানা করিয়া তুলিত।

বাহিরে খুট খুট করিয়া কি একটা মৃদু আওয়াজ হয়।

অন্ধকারে অন্ধকারে ছায়ার মত শৈলি ঘুরিয়া বেড়ায়; ঘরে আসিবার জন্ত বোধ হয় মেয়েটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; শিবরাম ভাবে আলোয় কি শৈলিকে আর একবার দেখা যায় না!

শিবরাম দেরী করিয়া ফেলিতেছে; এইবার টেমিটা হাত তুলিয়া লইয়া চলিল।

সম্মুখের অন্ধকার দুরন্ত একপাল ছেলের মত হুটোপাটি লাগাইয়া শিবরামের পিছনে আসিয়া লুকায়; তাহারা পা টিপিয়া টিপিয়া চলে, শব্দ হইলে যেন শিবরাম জানিতে পারিবে।

শিবরাম আগড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। দাওয়ার সমস্ত খানিকটা আলোকিত হইয়া গিয়াছে।

সম্মুখপানে চাহিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার একেবারে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে।

শিবরাম একেবারে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

উনানের কিছু দূরে ভাতের হাঁড়িটা বসানো ছিল, তাহার নীচে মাটির সরাটা দুখান হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়া আছে; আর কোথাকার একটা রুগ্ন হাড় বাহির-করা কুকুর সম্মুখের পা দুইটা হাঁড়ির উপর তুলিয়া দিয়া ভিতরে মুখ গলাইয়া সুগভীর আগ্রহে ক্ষুধার্ত্ত গ্রাসের পর গ্রাস ভাতগুলি গিলিয়া যাইতেছে। দেহের অনুপাতে তাহার জীর্ণ উদরটি অস্বাভাবিক ফুলিয়া উঠিয়াছে।

শিবরাম সে এক অদ্ভুতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ কুকুরটা একবার মুখ তুলিতেই তাহাকে দেখিতে পাইল; আশ্চর্য্য যে কুকুরটা এতটুকু পলাইতে চেষ্টা করিল না। নিষ্প্রভ বড় বড় চোখ দুইটি তুলিয়া করুণ মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

শিবরাম পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া পাশে একটা বড় বাঁশের মুগুর পড়িয়াছিল সেইটা তুলিয়া লইয়া দু'হাতে সজোরে কুকুরটির মাথার উপর আঘাতের পর আঘাত করিয়া চলিল। শিবরাম একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে।

কুকুরটি একবার আর্ত্তনাদ করিতে গেল, কিন্তু মুখের মধ্যে তখনও ভাতের পরিপূর্ণ গ্রাসটা ছিল বোধ হয়, স্বর আটকাইয়া গিয়াছে; তারপর সমস্ত শরীরটা একবার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, পিছনের পা দুইটি যতদূর যায় প্রসারিত করিয়া ছড়ানো রাশীকৃত ভাতের উপর মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া এলাইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ শিবরাম গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আস্তে আস্তে পিছনের পা দুটা ধরিয়া কুকুরটাকে সে তুলিয়া ধরিল। মাথাটা একেবারে ছেঁচিয়া গিয়াছে, দুই কষ বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত টপ্ টপ্ করিয়া ছড়ানো ভাতগুলির উপর পড়িতেছে। মুখের সেই ভাতের গ্রাসটি কিন্তু তখনও ঠিক তেম্‌নি করিয়া ধরা।

শিবরাম দুইহাতে টানিয়া সাম্‌নের মাঠে নিবিড়তর অন্ধকারের দিকে মরা কুকুরটাকে দূর করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। শুক্‌না পাতার রাশির উপর পতনের শব্দ শোনা গেল।

আকাশ ঘন মেঘে সর্বাঙ্গ মুড়িয়া তেমনি অচঞ্চল হইয়া পড়িয়া আছে। একটুকু বাতাস নাই। শিবরামের মাথার শিরগুলি দপ্ দপ্ করিয়া লাফাইতেছে। সমুখের রাশীকৃত ছড়ানো ভাতগুলি হঠাৎ পাগলের মত সে দু'পা দিয়া দাওয়া হইতে নীচের দিকে ছিটাইয়া ছিটাইয়া ফেলিতে লাগিল। ভাঙা হাঁড়ির কোণায় লাগিয়া পা কাটিয়া গেল, শিবরামের ভ্রূক্ষেপ নাই!

রাত হয়ত' তখন অনেকই হইয়াছে; একপাশে কেরোসিনের আলোটা তেমনি জ্বলিতেছে। শিবরাম মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

শিবরাম ঠিক ঘুমায় নাই; শুধু কেমন করিয়া যে রাতের অনেকটুকু কাটিয়া গেছে সে তাহা জানে না। কেরোসিনের কালো ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গিয়াছে; শিবরামের নিশ্বাস যেন আটকাইয়া যায়।

বাহিরে বোধ হয় তখন ঝড় উঠিয়াছে। ঘরের পিছনে তালগাছটার পাতায় পাতা লাগিয়া রূঢ় কর্কশ আওয়াজ হয়।

শিবরাম আর চোখ বুজাইয়া থাকিতে পারিতেছে না। মাথার মধ্যে অবিশ্রান্ত কাহারা যেন ভীষণ কোলাহল জুড়িয়া দিয়াছে। শিবরাম একটি বর্ণও তাহার বুঝিতে পারিতেছে না।

চোখ মেলিতেই হঠাৎ তাহার সমস্ত বিনিদ্র দৃষ্টিটুকু পড়িল গিয়া ভুতোর মুখের উপর।

শিবরামের বোধশক্তির স্নায়ুগুলি তখন কে যেন নির্দয়ভাবে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া ভাঙিয়া একেবারে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতেছে।

যতটুকু আলো পড়িয়াছে তাহাতেই দেখা যায় ভুতোর মুখটা বিকট ভাবে হাঁ হইয়া গিয়াছে; দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চোখ দুটি ঠেলিয়া যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। হাত পা টান্ করিয়া পড়িয়া আছে, অজস্র রক্তে কপাল লাল টকটকে দেখাইতেছে। চোখের দৃষ্টি স্থির, তাহা যেমন বিকৃত তেমনি প্রখর।

শিবরামের দেখিতে যা সময়টুকু যায়; ভুতোর বুকে যেখানে হাড়গুলি ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিয়াছে সেখানে হাত রাখিতেই তাহার সমস্ত সন্দেহ উড়িয়া যায়।

সন্ধ্যাবেলায়ও ভুতোর নিঃশেষিত আয়ুর অবশিষ্টটুকু এইখানটায় বুঝি ধুকধুক করিতেছিল, এখন তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভুতো বাঁচিয়া নাই!

শিবরাম চাহিয়া চাহিয়া দেখে, কুসুম ঘুমাইতেছে, পুঁটে কেলো হাবো অঘোরে ঘুমাইতেছে; উহারা জাগিবে ত'! কুসুম ত' কাল দেখিবে ভুতো এমনি ভাবে মরিয়া রহিয়াছে। দিনের আলোয় ভুতোর এ-বিকৃত মুখ শিবরামই বা দেখিবে কেমন করিয়া!

শিবরাম হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠে; আগড় খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাওয়ার এককোণে একটা কোদাল পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইল।

বাহিরের দুরন্ত দমকা হাওয়ায় আলোটা বুঝি নিভিয়া গেল।

যা'ক নিভিয়া; শিবরামের আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই। বেশ হইয়াছে: ভুতোর বিকৃত মুখ শিবরামকে আর দেখিতে হইবে না। অন্ধকার সব ঢাকিয়া দিয়াছে।

শিবরাম হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ভুতোর মৃতদেহটা বিছানার কাপড়ে ঢাকিয়া বুকে করিয়া তুলিয়া লইল।

সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত নিবিড় নিরন্ধ্র অন্ধকার। প্রবল বাতাসে পিটুলি গাছটা দুলিতেছে। আকাশ তেম্নি অচঞ্চল নিষ্ঠুর স্তব্ধতায় চাহিয়া আছে। শিবরামের পায়ে মরা-কুকুরটা বাধিয়া যায়। শিবরাম পা দিয়া তাহাকে একপাশে সরাইয়া দেয়। পিছনে শৈলি বুঝি কাঁদিতে কাঁদিতে আসে। শিবরাম পিছন ফিরিয়া তাকায় না। যদি শৈলি দূরে—অনেক দূরে সরিয়া যায়! শৈলি কাঁদুক!

শিবরাম শীতল মাটির তলায় ভুতোকে শোয়াইয়া দিয়া আসিয়াছে। ভুতো একটু ঠাণ্ডা হইয়া বাঁচুক! শিবরাম পুকুর হইতে আঁজলা আঁজলা জল তুলিয়া মাথায় দিতে লাগিল। এইবার পাশের ঘাসবনের উপর সে একটু বসিবে। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা।

কাহাদের একটি ছোট ছেলেকে বাঁধিয়া উহারা এমন বেত দিয়া মারিতেছে কেন? শিবরাম চিনিতে পারে—ভুতো না? শিবরাম চেঁচাইয়া বলিতে চায়—থামাও থামাও তোমাদের বেত, ভুতো যে মরিয়া যাইবে। কিন্তু কিছুতেই সে স্বর বাহির করিতে পারে না; ভুতোর মাথাটা থেঁৎলাইয়া গিয়াছে। ভুতোর পা ধরিয়া নিষ্ঠুর লোকগুলা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। শৈলি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—সব ভাতগুলো ফেলে দিলে বাবা, আমি যে অনেকদিন কিছু খাইনি!

শিবরাম ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল; কোথায় শৈলি? শৈলিও আসিবে না, ভুতোও আর আসিবে না! শিবরামের চোখের জল বাধা মানে না। যদি দুটো পুঁটে কেলো সবকেই এমনি করিয়া একে একে চলিয়া যায়! শিবরাম আর তাহাদের ছাড়িয়া দিবে না, সঙ্গে সঙ্গে চোখে চোখে রাখিবে। কুসুম হয়তো আর বেশীদিন বাঁচিবে না; তারপর শিবরাম উহাদের লইয়া অনেক দূর দেশে চলিয়া যাইবে। সেখানে শৈলি যাইতে পারিবে না, ভুতো যাইতে পারিবে না, সেখানে কুসুমও রহিবে না; এখানে শিবরাম আর থাকিতেছে না!

শিবরাম কোদালটা একহাতে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল। এইখানে অই বুড়ো নিমের গাছটার ছায়ায় ভুতো ঘুমাইয়া আছে, ওখান দিয়া সে আর যাইবে না!

সকালের আলো অল্প অল্প ফুটিয়া উঠিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার; খানিক পরেই হয়তো রোদ উঠিবে।

উঠুক রোদ; ভূতোর বিকৃত মুখ আর শিবরামকে দেখিতে হইবে না। ভূতো অনেক নীচে মাটির কোলে ঘুমাইয়া আছে; সেখানে সুস্থ ছেলেটা একটু ঘুমাইয়া বাঁচিবে। আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। কতদিনের অতৃপ্ত আশা বুকে লইয়া অভুক্ত ছেলেটা তাহার কুৎসিত দেহ, বিকৃত বেদনার্ত্ত মুখ আর কাহাকেও দেখাইতে আসিবে না। ভূতোকে একবার প্রাণ ভরিয়া শেষ দেখা দেখিয়া লইলে হইত! অন্ধকারে চোখের তারা ঠিক্‌রাইয়া কেন শিবরাম ভূতোকে একটিবারও অন্যের মত প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল না? হউক্ না বিকৃত মুখ সে ত' আর আসিবে না, সে মুখের মত মুখ ত আর কোথাও মিলিবে না! শিবরামের চোখে জল উপ্‌ছাইয়া আসে।

মরা কুকুরটাকে শিয়ালে টানিয়া একেবারে দাওয়ার কোলে আনিয়া ফেলিয়াছে। মৃত-দেহের অনেকটা খাইয়া লইয়া রাত শেষ হইতে না হইতে কখন তাহারা অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। নাড়িভুঁড়িগুলা ভিজা ঘাসের উপর জড়াজড়ি করিয়া পড়িয়া আছে।

শিবরাম একপাশ দিয়া সরিয়া আসিল। আগড়টা খোলাই রহিয়াছে—বড় একফালি রোদ পড়িয়া ঘরটা আলো হইয়া আছে। দাওয়াস্থ উঠিয়া কোদালটা সে একপাশে রাখিল।

কুসুম এখনও ঘুমাইতেছে বুঝি, ছেলেরা এখনও জাগে নাই—

সহসা শিবরামের সাম্‌নে ঘর দুয়ার গাছ-পালা সব চরকীর মত বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতেছে; রাতের অন্ধকারে ঘুমকাতর ছেলেটাকে লইয়া সে এ কী মর্ম্মান্তিক ভুল করিয়াছে! শিবরাম বুকফাটা আর্ত্তনাদ করিয়া সেখানেই লুটাইয়া পড়িল।

ভূতো ঠিক তেমনি করিয়া চোখ উল্‌টিয়া দাঁত বাহির করিয়া পড়িয়া আছে; আর তাহার পাশটীতে দুটোর জায়গা খালি—দুটো নাই!

ভারতের নারী ও তাহার কর্ম্মক্ষেত্র

শ্রীকল্যাণী দেবী
(চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী)

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া" ॥

পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে দেখিতে পাই শাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণ ভারতের নারীজাতির চতুষ্পার্শ্বে সংস্কার বিধিনিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য সীমারেখা টানিয়া দিয়া গিয়াছেন। স্বাভাবিক দক্ষতা থাকুক বা নাই থাকুক এই গৃহধর্ম্মের বাহিরে তাহার পদক্ষেপ করিবার অধিকার ছিলনা। যে ধর্ম্মজীবন ভারতের বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাতে নারী ছিল প্রবল অন্তরায়। অহিংসা ধর্ম্মের প্রচারক গৌতম বুদ্ধ সংসারে থাকিয়া সিদ্ধিলাভ অসম্ভব জানিয়া গভীর নিশীথে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। শত শত মুক্তিকামী মহাপুরুষ নারীকে সাধনার পথে বিঘ্ন বলিয়া জগতের নিকট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাই পুরুষের মুক্তিপথের কণ্টক, অপরাধী স্ত্রীজাতি কুণ্ঠিত হইয়া গৃহকোণেই আপনার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিল।

ভারতের এই অর্দ্ধজাতি যুগের পর যুগ একই ভাবে গৃহের অন্তরালে থাকিয়া পুরুষের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা যোগাইয়া আসিয়াছে। মাতা, জায়া ও কন্যারূপে তাহাদের নারী-জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায় জীবন আহুতি দিয়া, অম্লান বদনে জহরব্রতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া শতসহস্র নারী যে দিন ত্যাগ ও নিষ্ঠার আদর্শ দেখাইয়াছেন সেদিন এখনও অতীতে বিলীন হয় নাই।

এই চিরন্তনী নীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে কয়েকটী রমণী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা একমাত্র নারীজাতির নহে—সমগ্র ভারতের গৌরবের সামগ্রী। খনা, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি বিদুষী ও শাস্ত্রে পারদর্শিনী রমণীগণ প্রতিভাবলে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া আছেন। লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন। অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে সিংহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুলতানা রিজিয়া স্বল্পকাল হইলেও নিপুণতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। গড়মণ্ডলের রাণী দুর্গাবতী ও আহম্মদনগরের চাঁদ সুলতানা পরাক্রান্ত মোগল-সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাদের জীবনী আলোচনা করিলে মনে হয়, অনুকূল আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহায়তা পাইলে হয়ত নারীজাতি বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতে একেবারে অসমর্থ হইত না।

মহাকালের বক্ষে এই কয়েকটী নারীর আকস্মিক ও বৈচিত্র্যময় অভ্যুত্থান নারীবিশেষের ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে—সমগ্র নারীর জাতীয় ইতিহাস সৃষ্টি করে নাই। ভারতীয় নারীর

জাতীয় জীবন একই ছন্দে চলিয়া আসিতেছিল, তাহার ইতিহাস গড়িবার মত কিছু ছিলনা। যুগধর্ম্মের উত্থান পতনের সঙ্গে পুরুষ যখন জীবন সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়াছে—নারী তখনও তাহার আবেষ্টনের মধ্যে সুখ ও দুঃখের অনুভূতি লইয়া নিশ্চিন্তে বসিয়াছিল, এমনি ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। জাতির জননীর উপর এই যে একটা আবরণ টানিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে যেন কাহারও কিছু বলিবার ছিলনা। একান্ত স্বাভাবিক বলিয়া নারীর এই জীবন-যাত্রা পুরুষ চিরদিন মানিয়া আসিতেছিল—তাহার কর্ম্মজীবনের কথা ভাবিবার প্রয়োজন হয় নাই।

তাই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নারী যেদিন প্রথম তাহার অপরিসর কর্ম্মক্ষেত্র পশ্চাতে রাখিয়া বাহিরের দরবারে অবগুণ্ঠন খুলিয়া দাঁড়াইল সে দিন ভারতের বিস্মিত জনমানব তাহাকে অন্তরের সহিত উপযুক্ত অভিনন্দন জানাইতে পারিল না। অনেকেই তাহার এই বাহিরের অভিযানকে অন্তায় স্পর্দ্ধা বলিয়া উপহাস করিল। ভারতীয় নারীজাতির এই যে অভিনব জাগরণ ইহা তাহাদের জাতীয় বিদ্রোহ নহে—ইহা তাহাদের জাতীয় বিপ্লব। আবহমান কালের প্রচলিত জীবনধারাকে পরিবর্ত্তিত করিবার এই প্রথম প্রচেষ্টাই ভারতীয় নারীর প্রথম জাতীয় ইতিহাস।

অনেকে আপত্তি করিয়া বলেন পুরুষ ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু বিভিন্ন বলিয়া পুরুষের কর্ম্মজীবনকে অনুভব বা উপলব্ধি করিবারও যে নারীর অধিকার নাই একথা প্রতিপন্ন করিবার কোনও সার্থকতা থাকিতে পারেনা। স্বভাবের ধর্ম্ম যদি নারীকে পরিপূর্ণ ভাবে পুরুষের কর্ম্মজীবনের সঙ্গী হইতে না দেয় তবে তাহার জন্ত তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা বিকাশের পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়া দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। এই বাহিরে আসিবার পর হইতে নারী পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার কর্ম্মজীবনের সহায়তায় কতখানি অগ্রসর হইয়াছে জানিনা, কিন্তু তাহার জাতীয় জীবনের উন্নতির পথ যে মুক্ত করিয়া লইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নারী আজ বুঝিয়াছে যে তাহার সীমাবদ্ধ জগতের বাহিরে অসীম সুবৃহৎ জগৎ মানবজাতির সার্থকতার বিভিন্ন পথ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—সে আজ বুঝিয়াছে যে, সে শুধু নারী নহে—এই মহামানবের মধ্যে সে ও একটা মানুষের স্থান পূর্ণ করিয়াছে; বুঝিয়াছে যে তাহার জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে হইলে একমাত্র নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেই চলিবেনা—মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে।

এ সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই বর্ত্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের নারী পুরুষের সহকর্ম্মী রূপে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বাহিরের সংসর্গে আসিয়া নারী জাতি তাহার জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভাবিয়া দেখিতে গেলে একথা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে নারী তাহার বিশেষত্ব হারাইয়া বসে নাই—রূপান্তরিত করিয়াছে। যে মূলধন লইয়া তাহার গৃহধর্ম্ম চলিয়াছিল তাহাকেই সম্বল করিয়া গৃহ ও বাহিরের মিলিত কর্ম্মক্ষেত্রের সম্মুখীন হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

ভারতের নারীজাতির আজ যে নূতন অভিযান আরম্ভ হইয়াছে তাহা শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া কি রূপে প্রকাশিত হইবে কে বলিতে পারে? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নারীর জাতীয় গতিকে যে ভাবে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা যখন একবার বন্ধন মুক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে তখন ইহার গতি যে কতদূর ভাসাইয়া লইয়া যাইবে তাহার ধারণা করাও সুকঠিন। আমরা অক্ষম লেখনীর সাহায্যে ভারতের নারীর কর্মবিধি সীমাবদ্ধ করিবার সময় যেমন নারী আগমনের কল্পনাও করিতে পারেন নাই তেমনি মনে হয় হয়ত বা আমাদের ও কল্পনার অগোচরে অনাগত ভবিষ্যতে এমন কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা করিতেছে যাহাতে পৌঁছিয়া ভারতের নারী বিশ্বের দরবারে আপনার পরিচয় দিতে সক্ষম হইবে।

"দূরে আছ তাই নিতি বাজে গীতি"

শ্রীগুণেন্দ্র নাথ দত্ত
(দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী)

কৈশোর শেষ হয়নি তখনো বয়স হয়েছে ষোল
সবুজের বেশে যৌবন মোরে বলে আজি দ্বার খোলো।
স্বপ্নপুরীর অজানা পথের যাত্রী তুমি যে আজ!
খোলো দ্বার খোলো—হে মোর পথিক পর বসন্ত সাজ।

নূতনের বেশে পুরাতন আজ দিল মোরে দরশন
জীর্ণ তন্ত্রী সাহানার সুরে করে মোরে আবাহন;
পুষ্পিত বন-বীথিকার মাঝে আধফোটা ফুল-কলি
ভ্রমরে আজিকে ডাকিতেছে কেন 'ফুটাও আমারে' বলি'

মধুপ ফিরিছে মাধবী কুঞ্জে পরাগ মাখিয়া গায়
তারি পানে কেন কুন্দকলিকা বারে বারে ফিরে চায়।
ফাগুনে আজিকে লাগে বনে দোলা জাগে বনে শিহরণ
দখিনা বাতাস কুসুম অধরে আঁকি' দেয় চুম্বন।

শিহরি' আবেশে সে পরশে হায় ফুল-কলি ওঠে দুলি'
মলয় তাহার কানে কানে কয় "গিয়াছ কি সখি ভুলি"?
মাথা নাড়ি' ফুল বারে বারে চায় রক্তে রাঙিয়া গাল
ইসারায় তারে বলে দেয় যেন, "আবার আসিও কাল"!

* * *

তটিনীর বুকে তরী সারি সারি চলে অসীমের পানে
দিগন্তকোলে মিশে যায় তারা প্রাণ স্রোতের টানে।
ওপারে নিভৃতে বালুচরে বসি এক চখা এক চখি
ঠোঁটে ঠোঁট দিয়া একি কথা তারা কহিতেছে চোখা-চোখি।
সূর্য্য তখন রক্তে রাঙিয়া পশ্চিমে যায় চলি'
পথিক চাহিয়া পথপানে চলে বেলা আর নাহি বলি'
চখা বলে "সখি এমনি করিয়া রব সুখী দুই জনে"
"বালুচরে মোরা বাঁধিব বাসর" চখি বলে সুখী মনে।

তারপরে হায় সময়ের স্রোতে ভেসে গেল দুটি প্রাণী
মিলনের বুকে আসিল বিরহ কেন তাকি আমি জানি?
দূর থেকে শুধু ভেসে আসে এক রাখাল ছেলের গান
আঁখিজল-ধোয়া সে গানে আমার ভরি' দিল মন প্রাণ।
বহুদূর হতে ভাসিছে বাঁশরী বিরহ বিধুর তান,
বাতাসে ভাসিয়া এলো কাছে মোর, হৃদয়ে বহে উজান।

* * *

এসেছিলে তুমি, কল্পনাময়ি, তরুণ অরুণ রথে;
নিয়ে হাসি, রূপ, হৃদয়ের মধু, আমার জীবন-পথে।
তখনো চিত্তে জাগে নাই সাড়া, চাহিনি তোমার পানে,
বরণ করিয়া নিইনি তোমায় কুসুম অর্ঘ্য দানে।
চঞ্চলা মনা চকিতে চাহিয়া চলি' গেছ দূরে সরি'—
আজিকে ফাগুণ জাগিয়াছে বনে—মনের আগুনে মরি।

মাঝিরা সকলে খেয়া তরী বেয়ে চলিছে ওপার পানে
গৃহে ফেরে যারা নদীর বক্ষ ভরি' দিল তারা গানে।
ওপারে নদীর চরের উপরে বাঁধিয়াছে যারা ঘর
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিল তাহারা—জ্বলিল নদীর চর।
গ্রামের বধূরা মাটীর কলস ভাসাইয়া দিয়া জলে
এপারের পানে চেয়ে থাকে শুধু জল ভরিবার ছলে।

* * *

তারপর সখি, তোমার লাগিয়া কত রাতি কাটে জাগি'
ভেবেছি তোমারও রজনী কাটিছে জাগিয়া আমার লাগি'
মুলতান সুরে বাঁশী কেঁদে মরে বুকভরা ব্যথা নিয়া
বাউল বাতাস তোমারি বারতা হিয়মাঝে আনে, প্রিয়া ;
বর্ষার দিনে বৃষ্টির সনে নীরবে নয়ন ঝরে
সঙ্গীবিহীন মোর রাতি দিন কত কথা—মনে পড়ে।

* * *

বৃথা হোলো মোর স্বপ্ন-প্রয়াস, বৃথাই বকুল-মালা।
বৃথা হ'লো মোর নয়নের লোর, বৃথা এ প্রাণের জ্বালা।
মুষ্টিতে তুমি ধরা নাহি দিলে, ওগো কল্পনা-রাণী ;
অলকায় থাক, যক্ষিনী-বধু! মেঘেতে পাঠাব বাণী।

শ্রাবণ গগণে পাগল বাদল যেদিন আসিবে নামি
ছন্দ মালায় রচি উপহার দানিব তোমারে আমি
উষারূপে যবে উদিবে সুনীলে প্রীতির গগনে প্রিয়া
ভোরাই রাগিনী গাহিব ঝাঁঝর বুকের বেদনা দিয়া!

চোখের আলোকে ধরা নাহি দিলে—থাক সে অলখ্ পুরে;
দূরে আছ তাই নিতি বাজে গীতি স্মৃতির বেদনা সুরে॥

সাহিত্য, সাহিত্যিক ও পাঠক

শ্রীনৃসিংহ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ।
(প্রাক্তন ছাত্র)

সাহিত্যে লেখকের একটা ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। এটা সাহিত্য বিচারের অতি প্রাথমিক কথা। কারণ সাহিত্যে যদি কাহারো ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া ওঠে ত লেখকের; প্রকাশক বা মুদ্রাকরের নহে; এবং ব্যক্তিত্ব একটা ফুটিয়া উঠিতে বাধ্য।

সে ব্যক্তিত্ব যতটা তেজাল, যতটা মূর্ত্তিমান ও যতটা আনন্দের হইয়া ফুটিয়া ওঠে ততটা বোঝা যায় লেখকের কল্পনা ও সৃজনশক্তি ও তাঁর ভাষা, বস্তু ও রসের প্রতি যথার্থ দরদ। যে কোন ভালভাষার লেখকদলের মধ্যে এটা প্রতিযুগেই অল্প-বিস্তর পরিব্যাপ্ত। এটাই যে কোন ভাল জাতের চির জাগ্রত, চির মুখর সাক্ষ্য বিশেষ যাহা জাতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যরূপে জাতির মানসিক ও সাংকেতিক ইতিহাস গড়িয়া তোলে। যে সাহিত্য একটা জাতির অপেক্ষা সমগ্র জগৎকে বেশী করিয়া সংকেত করে, জগতেরই বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তোলে, তাহা বিশ্বসাহিত্য।

সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়াই সাহিত্য-অসাহিত্যের বিচার সম্ভব হয় এবং সাহিত্যের সমুদায় বিবেচ্য ও বিচার্য্য বিষয় চোখে ধরা পড়ে। লেখক কিন্তু এ ভাবে, সাহিত্যের বিবেচ্য ও বিচার্য্য বিষয় গুলি ধরিয়া ধরিয়া, গেরো বাঁধিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। সে কাজ সমালোচকের। অবশ্য এমন লেখক আছেন যিনি উপক্রমণিকার দ্বারা বা লেখার ভিতর দিয়া বাহ্যতঃ নিজের সমালোচনা করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু আসলে এই সমালোচনাও মূললেখার একটা অঙ্গবিশেষ, তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশের একটা প্রবলস্পর্শী অবলম্বন মাত্র। লেখার সমালোচনা নহে। সেখানেও তিনি মাত্র লেখক। তিনি যখন অপরের লেখার বা সাধারণ সাহিত্যের সমালোচনা করেন তখনি তিনি সমালোচক।

সাহিত্যের কাজ সৃজন, সমালোচনার কাজ সেই সৃষ্টি হইতে আনন্দ গ্রহণ ও আনন্দ না পাইলে সেই মত মনোভাব প্রকাশ। লেখকের প্রধান অবলম্বন কল্পনার দ্বারা বাস্তবকে সাজাইয়া গুছাইয়া বলার মতো করিয়া বলা। শুধু ঘটো তোলাই তাঁহার ব্যবসা নয়। সমালোচকের প্রধান অবলম্বন ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত গুণের সামঞ্জস্য অনুমান বা নির্ণয় করিয়া ভাষা বস্তু ও রসজাত সবটুকু আনন্দ নিঙড়াইয়া গ্রহণ করা। দোষ ও ত্রুটীর ইঙ্গিত থাকিতে পারে কিন্তু তাহা লইয়া নাড়া চাড়ার মাত্রা বাড়াইলে সমালোচক ক্রমে সাহিত্য হইতে দূরে চলিয়া যান; কারণ লেখকও নিজের অজ্ঞাতসারে সবচেয়ে ঐ দোষ ত্রুটী এড়াইয়া চলিতে চাহেন হয়তো সম্পূর্ণভাবে পারেননা। সাহিত্য যখন মানবের তখন তাহাও নির্দ্দোষ হইতে পারেনা। যথার্থ সাহিত্যে স্থান কাল ও পাত্রের প্রভাবে এমন অনেক কিছু জিনিষই থাকতে পারে যাহাতে নীতি দুর্নীতির কথা উঠিতেই পারে না। প্রশ্ন ওঠে, কতটুকু আনন্দ সে দিতেছে? তাহাই তাহার সাহিত্যত্ব। যে লেখক অনকেটা আনন্দ দিতে পারেন তিনিই বড় সাহিত্যিক;

কারণ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যবত্তাও অনেক বড়। যে সমালোচক এই কাজটুকুতে যতো বেশি সহায়তা করেন তিনি তত বড় সমালোচক ; আনন্দ প্রাপ্তির সহায়ক বলিয়া তিনিও সাহিত্যিক, সমালোচনায় তাঁহারও ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া ওঠে। সাহিত্য প্রচার কার্য্যে অর্থাৎ তাহার মারফৎ আনন্দ-প্রচার যৌথ ব্যবসায়ে লেখক ও সমালোচক উভয়ই প্রায় সমান কর্ম্মী।

কিন্তু সমালোচকের আগে লেখক, লেখার উপর সমালোচনা। এই সামান্য কারণে মূল সাহিত্যের ধারা ও ধরণ বদলাইয়া গেলেই সমালোচনা সাহিত্যেরও ধারা ও ধরণ বদলাইয়া যায়। ইংলণ্ডের চার্লসের সময়ের সমালোচনার ধরণে 'শ'র যুগের ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচনা বাতুলতা মাত্র; কারণ সমালোচনা ঠিক শাসন নয়।

কিন্তু এই আগে পিছুর জন্য মূল সাহিত্য বড়ো ও সমালোচনার সাহিত্য ছোট, এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ধার সাহিত্য ধারেনা। একদিক দিয়া যেমন সমালোচনা-সাহিত্য মূল সাহিত্যের আনন্দ আহরণ করে তেমনি নিজের মৌলিকত্বের জন্য সে নিজে নিজে কিছু আনন্দের সৃষ্টি করে, সমালোচনার সমালোচনা সে আনন্দ আহরণ করিয়া সাহিত্যানুরাগীর চক্ষে ধরিয়া থাকে। সমালোচনা কেবল সমালোচক নহে। সে স্রষ্টাও বটে। পাঠ করেন, এই অর্থে যাঁহারা পাঠক তাঁহারা সাহিত্য সম্বন্ধে মতামত দেন, যুক্তি দেখান, সবই যেন ভাবান্তরে পড়িয়া, নিতান্ত সভা সমাজে আছেন বলিয়া। আরো একদল পাঠক আছেন যাঁহারা সুন্দরকে দেখিয়াও দেখেন না, আনন্দ পাইয়াও পান না, সুন্দর অপেক্ষা আরো মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বেড়ান এবং আনন্দ ছাড়াও আরো মুখ্য কারণ অনুসন্ধান করেন। ইঁহারা সাহিত্যের কেহ নহেন, ইঁহাদের অর্ডারের সাহিত্য আজ পর্য্যন্তও লেখা হয় নাই, হইবেনা। অমুক যদি এইখানটায় এই করিত, ঐ খানটায় ঐ না করিয়া সেই করিত তাহা হইলে চমৎকার হইত— এই ভাবে সাহিত্য বিচার চলে না। কারণ কি হইলে, কি না হইলে সাহিত্যবস্তু বজায় থাকে বা বাড়িয়া যায় সেরূপ হিসাব প্রচেষ্টাই অসমালোচনা। যাহা আছে তাহা লইয়াই সমালোচনা ; অন্য কিছু আন্দাজ করিয়া নহে। সাহিত্যে আন্দাজ চিকিৎসা চলেনা। চলে মাত্র ভাষায়। সেখানেও কিন্তু ব্যাকরণের যুক্তি ছাড়া চিকিৎসা নাই। এবং নির্ভুল ব্যাকরণই সাহিত্য নহে। সাহিত্যবত্তা পাইতে গেলে ব্যাকরণ (যাহা মাত্র প্রকাশ করে, কখনো প্রচার বা বিস্তার করেনা) ভাষাকে লইয়া ও তাহার সহিত বস্তু ও রসের মিলনের দ্বারা তাহারই একটা অপূর্ব্ব মধুচক্র রচনা করেন সাহিত্যিক।

ভগবান্ বিভ্রাট

—মালতী সোম
(তৃতীয় বর্ষ, কলা)

ছোট্ট মেয়ে। মুখে চোখে চঞ্চলতার ছাপ মাখানো, চব্বিশ ঘণ্টা খালী দুষ্টুমী আর দুষ্টুমী। বাড়ী শুদ্ধ লোক অস্থির! দুষ্টুমী করেই শুধু ক্ষান্ত নয়; প্রশ্নে প্রশ্নে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সবটাতেই তার যুক্তির বহর অথচ কদিনই বা কথা বলতে শিখেছে! গুছিয়ে ভাল করে কথা বলতেও শেখেনি অথচ একগুচ্ছের "কী" আর "কেন" সে কোথা থেকে শিখলে কে জানে!

বাবার কাছে প্রশ্ন ক'রে সে প্রায় সব সময়ই উত্তর পায় কিন্তু মার দৈর্ঘ্য বেশীক্ষণ থাকেনা। আবার মাকেই সে কাছে পায় বেশী! মা হয়তো খুব কাজে ব্যস্ত; মাঝখানে মেয়ে তার দুষ্টুমী মাখানো চোখে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে এসে দাঁড়ায়। মা কিন্তু মেয়েকে রীতিমত ভয় পান। ভাবেন—"এই রে! ঘ্যানর ঘ্যানর করতে করতে মুখ এবার ব্যথা হবে।" তাড়াতাড়ি মেয়েকে কোন ছলে অন্যত্র পাঠাতে চেষ্টা করেন। মেয়ে কিন্তু নাছোড়বান্দা। অবশেষে বকুনি দিয়ে মেয়েকে সরান যায়। এদিকে আবার যতক্ষণ প্রশ্ন না চলে ছোট্ট মেয়েটি নিজেকে বিশ্রাম দেয় না মোটেই। সে তার হাত পায়ের কাজে ব্যস্ত থাকে কিন্তু বেশী প্রশ্ন করতে গেলেই সে বেচারী বকুনী খায়। তাই নয়, যখন সে খুব বেশী মনোযোগ দিয়ে তার কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে হঠাৎ মা কোথাথেকে এসে সব গোলমাল করে তো দেনই উপরন্তু তার কানে গালে পিঠে সশব্দে এমন সব কাণ্ড করেন যাতে সে বেচারী চেঁচিয়ে ওঠে আর তার চোখে জল ছাপিয়ে আসে। সে ভাবতে বসে মা যখন কথা বলেন, কাজ করেন তাঁকে কেউ কেন বকেনা।

এদিকে মারও ভাবনা মস্ত! তিনি ভাবেন মেয়েটাকে নিয়ে কী করা যায়! অথচ মেয়েকে বকুনি দিয়ে আর গায়ে হাত তুলে মার মন অনেক সময়ই খারাপ হয়ে যায়! ভেবে চিন্তে মার মাথায় এক বুদ্ধি এল। পরদিন থেকে ছোট্ট মেয়েকে কাছে বসিয়ে সময়ে অসময়ে তিনি তাকে ভগবানের কথা গল্প করে বলতে লাগলেন। ভগবান অনেক উঁচুতে আকাশে থাকেন। সব্বাই কি করে দেখতে পান; দুষ্টুমী করলে, মাকে বিরক্ত করলে, আকাশ থেকে পাপ ফেলে দেন! আবার তাঁকে ভোরে সন্ধ্যায় রোজ ডাকলে তিনি সবারই উপর খুসী হন ইত্যাদি আরো কত কী! ছোট্ট মেয়ে খুব উৎসাহ নিয়ে বড় বড় চোখ করে সব শোনে আর নূতন ধরণের প্রশ্ন আরম্ভ করে। সে কোনদিন কি করছে তাতে ভগবান রাগ করবেন কী খুসী হবেন, ভগবান আকাশে কত উঁচুতে থাকেন, নীচে আসেন না কেন এরকম ধরণের নানা রকম প্রশ্ন করে করে সে ভগবান সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য আবিষ্কার করে ফেল্‌লো। তাছাড়া যখন সে শুনতে পেলো ভগবান শুধু আকাশেই থাকেন না পৃথিবীতে সব কিছুর মধ্যেই আছেন আর তাঁকে ডাকলেই তিনি শুনতে পান তখন সে ভোরে সন্ধ্যায় রীতিমত ভগবানকে ডাক্‌তেও শিখ্‌লো।

ফলে তার দৌরাত্ম্য ও উপদ্রব অনেক কমে এল। মাকে এখন আর অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। ভগবানের গল্পই তার খুব ভাল লাগে। সে এখন সব জিনিষ থেকেই ভগবানকে আবিষ্কার করতে শিখেছে। খেতে বসে তার নুন থেকে আরম্ভ করে ডাল ভাত তরকারি পর্যন্ত সব থেকেই সে এমন ভাবে ভগবানকে যখন তখন যেখানে সেখানে এনে উপস্থিত করতো যে বাবা মা হেসে লুটিয়ে পড়তেন আর ছোট্ট মেয়েটি অপ্রস্তুত হয়ে চটে যেতো আর ভগবান অলক্ষ্যে হাসতেন কিংবা তাঁকে নিয়ে স্থানে অস্থানে টানাটানি করবার সাজা বাবাকে দেবার জন্য মাকে শাস্তি দেবার মতলব করতেন জানিনা!

এদিকে দিন যায়। মাকে কাজের সময় বিরক্ত হতে হয়না। মেয়ের দুষ্টুমি কমায় তাঁর সদাশঙ্কিত ভাবও কমেছে। তাই তিনি খুসী। এর মধ্যে হঠাৎ বাবা এসে একদিন বল্লেন—"এতদিন ভুগে—ভুগে—তোরা ভগবানবাবু আজ ভোরে মারা গেলেন"। (বলা বাহুল্য ভগবানবাবু তাঁদের বিশিষ্ট বন্ধু না হলেও বিশেষ পরিচিত।) মা বাবা ভগবানবাবুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন ও মৃতের সন্তান সন্ততি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। ছোট্ট মেয়ে কাছেই ছিল তাকে তাঁরা এ আলোচনায় টানলেন না। ছোট্ট মেয়ে এসব বুঝবেই বা কি!

ছোট্ট মেয়ে কিন্তু সবই বুঝলো; অনেকক্ষণ ধরে সবই সে শুনলো। বাবা মা কেউই তাকে কিছু বল্লেন না কিন্তু সে হঠাৎ কেঁদে ফেল্লো। মা বল্লেন "ওকি রে! ভগবান বাবুকে তো তুই চিনিস্‌ও না দেখিস্‌ও নি; কাঁদছিস্ কেন?" ছোট্ট মেয়ে আরও জোরে কেঁদে উঠে বল্লো "ভগবান যে মরে গেলেন মা আমি আর কাকে ডাকবো?" মা-বাবা দুজনেই খুব জোরে হেসে উঠলেন, বল্লেন—"ভগবান আবার মরে কী করে রে! মরেছেন তো ভগবান বাবু।" সে কান্না না থামিয়েই বল্লে, "হাঁ হাঁ তা বই কী! বাবু তো তোমরা সবাইকেই বল!"

জাতি গঠনে স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীঅমূল্য কুমার মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী (সাহিত্য)

দুইশত বৎসরের নিপীড়িত ভারত আজ আর পীড়ন সহিতে পারে না। হৃত আসন, গতবিভব বিদেশীর পদদলিত, বুভুক্ষু, আশাহীন, ভাষাহীন, অন্ধ, দরিদ্র, ভারত পরাধীনতার এ পাষাণ ভারে আজ পিষ্ট। ঐশ্বর্যময়ী জননীর শতশত সন্তান ক্ষুধায় এককণা অন্ন পায় না, গাত্রে এতটুকু বস্ত্র পায় না, মাথা গুঁজিতে একতিল ভূমি পায় না। তাই, শত বৎসরের অত্যাচারে ভারত আজ জাগিয়াছে। দীন দরিদ্র, ধনী মধ্যবিত্ত, ভদ্রাভদ্র, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য সকলে এক সঙ্গে মুক্তিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে। ভারতবর্ষের ভ্রান্তি টুটিয়াছে। ভারত বুঝিয়াছে যে দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পণ্ডিত মূর্খ সকলে তাহারা ভাই, একই মায়ের সন্তান, একই মায়ের সেবক। কিন্তু স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভদ্রাভদ্র দীন দরিদ্র শিক্ষিতাশিক্ষিতের এ বিরোধকে দূর করিলেন, সমগ্র ভারতবাসী-কে এক সূত্রে গ্রথিত হইবার বাণী প্রথম কে প্রচার করিলেন, বিদেশীর অনুকরণরত জাতিকে জাতিত্ব সম্বন্ধে কে সচেতন করিলেন ? তিনি বাঙ্গলার সন্তান, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ !

ভীরু, কাপুরুষ, পশ্চাৎপদ জাতির বুকে তিনি বল দিয়াছেন। দিয়াছেন হৃদয়ে আশা ! যখন প্রবল বিদেশীয় সভ্যতার বন্যায় দুর্বল অনুকরণপ্রিয়জাতি তৃণের মত ভাসিয়া যাইতেছিল, ইংরাজী শিক্ষার অহমিকায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, সর্ব্বক্ষেত্রে বিদেশীর অনুকরণ করিতে গিয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছিল, "ে টলোক" নামে আখ্যাত দেশের গরিষ্ঠ জনসমাজকে অত্যাচারিত উৎপীড়িত করিয়া জাতিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া ধ্বংসস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল, দেশের সেই দারুণ দুর্দিনে জন্ম নিলেন দেশ প্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

সে দারুণ দুর্বিপাকে, দেশের মৃত্যুক্ষণে, একদিকে যখন একদল স্বার্থান্ধ তথাকথিত শিক্ষিত জনসমাজ আপন স্বার্থকেই ধ্যানজ্ঞান করিয়া লইয়াছিল, এবং আর একদিকে দেশের দরিদ্রগণ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া তাহাদের আত্মপূজার অর্ঘ্য যোগাইতেছিল, যখন দেশের আদর্শ দূষিত, দেশের কল্যাণময়ী মাতৃজাতি সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শ ত্যাগ করিয়া বিলাতী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত, যখন সমাজ লাঞ্ছিত, শিক্ষা বিকৃত, ব্রাহ্মণ দলিত, জাতি অধঃপতিত, সেই সময় একদিন ভারতের পূর্ব্বকোণে আবার বেদান্তের গান উঠিল। হতাশাদীর্ণ ভারতের বুকে আশার তুফান তুলিয়া বাণী স্ফুরিল :—

"হে ভারত, ভুলিওনা—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিওনা তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিওনা তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিওনা, তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত ; ভুলিওনা—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিওনা—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার ভাই তোমার রক্ত ! হে বীর ! সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ! বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ! তুমি ও কটিমাত্র

বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর। ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ; আর বল দিন রাত হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায়—মানুষ কর!"

বিদেশীর আপাতমধুর বহির্মুখ সভ্যতার তিনি অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন। তাহাদের যে রীতি নীতি, যে আচার ব্যবহার মোহ সৃষ্টি করিয়াছিল, সে মোহ অপসারিত হইল। তিনি বলিলেন "প্রথমে বুঝতে হবে যে এমন কোন গুণ নেই যা জাতি বিশেষের একাধিকার! তবে কোন ব্যক্তিতে যেমন কোন জাতিতে তেমন গুণের আধিক্য—প্রাধান্য! খুঁজে দেখ আমরাও নিঃস্ব নই!" উজ্জ্বলালোকে আভ্যন্তরিক অবস্থা দেখিয়া মোহমুগ্ধ ভারত ভাবিল তাইতো এ কি! এ তো পথ নয়! আমি তো শুধু আমি নয়, আমার নয়! আমার শুভ জাতির শুভে, আমার কল্যাণ দেশের মঙ্গলে! জ্ঞান ফিরিল, অজ্ঞতার তমিস্রা দূর হইল। নূতন আলোকে নূতন শক্তির জন্ম হইল। সমগ্র জগতের সম্মুখে সে বিবেকানন্দের বাণীকে রূপ দিল, কায়া দিল। কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত ভারতের আচণ্ডাল সবাকার বন্ধু ভারতের নূতন ঋষি আবার গাহিলেন, ভারতের কল্যাণ আমার ইষ্ট, ভারতবাসী আমার রক্ত, ভারতের হরিজন আমার প্রাণ।

বিবেকানন্দ দিয়াছিলেন মুক্তি মার্গের পাথেয়, জাগরণের প্রেরণা! যাহারা সংস্কারক হইবে, দেশ প্রেমিক হইবে, তাহাদের বলি অনুভব কর। তোমাদের কি সেই অনুভূতি আছে? তোমরা কি অনুভব কর দেবতা ও ঋষির কোটি কোটি বংশধর আজ পশুর সামিল হইয়া পড়িয়াছে? তোমরা কি মনে কর কোটি কোটি নরনারী অনাহারে শুখাইয়া মরিতেছে...... তোমরা কি অনুভব কর দেশের উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে—অজ্ঞানতার কৃষ্ণবর্ণ মেঘ! এই চিন্তা কি তোমাদিগকে অশান্ত করে? তোমাদের চক্ষের ঘুম কি কাড়িয়া লয়?—দেশবাসীর দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন কি মনে হইয়াছে যে দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে বুঝি পাগল হইয়া যাইব? বেদনা, সমস্ত প্রাণ হইতে বসিয়াছে, এই বেদনা, ইহাই কি তোমার একমাত্র ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে! আর সমস্ত চিন্তা কি তুমি বিসর্জ্জন দিয়াছ? তুমি কি নাম ভুলিয়াছ, খ্যাতি ভুলিয়াছ, স্ত্রী পুত্রের কথা ভুলিয়াছ? যাহারা দেশ প্রেমিক হইবে ইহাই হইবে তাহাদের প্রথম সোপান। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জনসাধারণকে শিখানো হইয়াছে যে তাহারা ছোট, তাহারা হীন, তাহারা অধম! তাহাদিগকে বলা হইয়াছে তোমাদের কোন মূল্য নাই। এবং ভীত জনসাধারণ শুনিয়া আসিতেছে তাহারা মানুষ নহে। শত শত বৎসর এই কথা শুনিতে শুনিতে সাহস হারাইয়া তাহারা প্রায় পশুর কোঠায় নামিয়া আসিয়াছে। তাহাদের কর্ণে কেহ আত্মার কথা উচ্চারণ করে নাই। তাহাদিগের নিকট ঘোষণা কর আজ আত্মার বাণী; বল যাহারা সকলের নীচে তাহাদিগের ভিতরেও আত্মা আছে। সেই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই।......

তিনি অমর; তাঁহার আদিও নাই অন্তও নাই, তিনি অপাপবিদ্ধ, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী আত্মা।" এই যে অক্ষয় অমর মহতী বাণী আজ রূপ লইয়াছে তাহা তাঁহার কণ্ঠেই উচ্চারিত হইয়াছিল, তিনি জাতি গঠন করিতে শিখিয়াছেন, শিখিয়াছেন আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে, মুচি মেথরকে ভাই বলিতে। তাঁহারই রোপিত বীজ আজ বিটপী হইয়া ফলপ্রসব করিতেছে। তাঁহারই মন্ত্র লইয়া আজ আর একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিতেছেন, তাঁহারই মন্ত্রে দীক্ষিত দেশবাসী আজ সে যজ্ঞে আত্মাভিমান বলি দিয়াছে।

নিঃশেষে আপনার যথাসর্বস্ব ঐশ্বর্য মান অপমান বিলাইয়া দিয়া ভারতযখন মো নিদ্রায় অচেতন, বিবেকানন্দের তেজদীপ্ত সিংহনাদ তাহার ঘুম ভাঙ্গাইল। শিক্ষিত জনসমাজ এতদিন কেবল নিজেদের লইয়াই ব্যস্ত ছিল, পুঁথি পড়া, চাকুরী করা, পাশ্চাত্যের অনুকরণ করা এবং অবসর সময় আহার বিহারে ব্যয় করা ব্যতীত অন্য কিছু জানিবার তাহাদের অবসর ছিল না, হৃদয় ছিলনা। অস্পৃশ্য অজ্ঞতার তমসাবৃত, নিরন্ন, গৃহহীন, ভারতবাসীর কথা তাহাদের চিন্তায় স্থান পায় নাই। দরিদ্রের ব্যথা বুঝিবার কেহ নাই। অভিযোগ শুনিবার কেহ নাই, তাহাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিকার করিবার কেহ নাই। তাহাদের সর্বত্র বিচরণ করিবার পর্যন্ত অধিকার নাই। তাহাদের দুর্দশা একজনের প্রাণ কাঁদাইল। তাঁহার—অগ্নিবচন দিগন্তে ধ্বনিয়া উঠিল। অস্পৃশ্যের কর্ণে, দরিদ্রের কর্ণে, নীচের কর্ণের দৈববাণী হইল "কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া তুমিও সদর্পে বল ভারতবাসী আমার ভাই।"

বিমুখ, দর্পিত, অহমিকাক্ষ জনসমাজের মনে দরিদ্রের আসন পড়িল। সে দিন সকলে বুঝিল "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

বুঝিল যে "জাতির মেরুদণ্ড এরাই সব দেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্ন বস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথরেরা কোলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা হুতাশ লেগে যায়, তিন দিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে দেশ উজোড় হয়ে যায়। শ্রমজীবিরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্ন বস্ত্র জোটেনা। এদের তোরা ছোটলোক ভাবছিস্ আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস্। তাইতো বলি,—তোরা এই Mass এর ভেতর যাতে শিক্ষার উন্মেষ হয় তাতে লেগে যা। ওদের বুঝিয়ে বলগে, তোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ; আমরা তোমাদের ভালবাসি, ঘৃণা করিনা।" তাঁহার এই বাণীতে দেশের চিন্তাস্রোত নূতন পথে ধাবিত হইল। পুরাতন সংস্কার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল—দেশ সত্য পথ চিনিল।

জাতির মুষ্টিমেয় জনসমাজ লইয়া যে জাতি কোন দেশে কোন কালে বড় হইতে পারে না এ ধারণা তিনিই লোকের মনে জাগাইয়া দিয়াছিলেন। উপেক্ষিত উৎপীড়িত দরিদ্র সমাজ তাহার বচনে পুনর্জীবন পাইল।

সর্বনাশা নিদ্রার ঘোর হইতে, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ হইতে তিনি ভারতকে মুক্ত করিলেন, যখন অপমান ছিল নিত্য প্রাপ্য, আশা ছিল দূর, জীবন ছিল চাঞ্চল্যহীন, হৃদয় ছিল আত্ম-অবিশ্বাসী, তখন তিনি আসিলেন—শরণাগতের আশ্রয় রূপে, দরিদ্রে নির্ভর রূপে, দুর্বলের

অস্ত্ররূপে, রণক্ষেত্রে সেনাপতিরূপে। দিগদিগন্তে বজ্রবাণীর তূর্যাধ্বনি তুলিয়া মুক্তি আহবের যোদ্ধৃরূপে দেখা দিলেন। তিনি দীপ্ত সূর্যের মত ভাস্বর, বাণী তাঁহার অগ্নিগর্ভ—বজ্রের মত দেশবাসীর মর্মে মর্মে গভীর দাগ কাটিয়া দিল। ভারতের ভূমিতে সাম্য, মৈত্রীর বীজ বপন করিলেন।

মৃত্যু তাঁহাকে বহুদূর নিয়া গিয়াছে; কিন্তু ভারত তাঁহাকে ভোলে নাই। ভারতের শত শত কণ্ঠে একসঙ্গে তাঁহার বচনই উচ্চারিত হয়। তাঁহার—দীপ্ত বাণী আজ দেশের ভিতর কায়া পাইয়াছে। সন্ন্যাসীর পাঞ্চজন্যের গম্ভীর নির্ঘোষ আজও দেশের ভিতর ধ্বনিয়া উঠিতেছে।

ভারতের নবজাতির তিনি পিতা, ভারতের নবমন্ত্রের দীক্ষাগুরু।

ফ্যাসিষ্ট ইটালীর তরুণদল

শ্রীকালী চরণ দাস।
প্রথম বর্ষ (সাহিত্য)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে জগতের সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, রাষ্ট্র, সংসার—সব কিছুকেই ঘিরিয়া সংস্কারের এক অভিনব অভিযান সুরু হইয়াছে। জীর্ণ-পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া কল্যাণময় নূতনের প্রতিষ্ঠা করাই সে অভিযানের উদ্দেশ্য।

জগতের অন্যান্য দেশের মত ইটালীতেও এ অভিযান সুরু হইয়াছে। ইটালীতেও পুরাতন জীর্ণ রীতি নীতির বিরুদ্ধে সংস্কারকামী নবীনের বিরাট আন্দোলন বিধাতার আশীর্বাদের মত অপরূপ কল্যাণ বহিয়া আনিতেছে।

পোপের ধর্মের আবছায়ায় ইটালীর দেহে মনে জড়তা আসিয়াছিল। গণ আন্দোলনের নেতা হার হিটলার, আয়ার্ল্যাণ্ডের ডি ভেলেরা, সোভিয়েট রাশিয়ার লেনিন ও ষ্টেলিন এবং তুরস্কের কেমাল পাশার মত ইটালীর মুসোলিনী ইটালীর জীবনে এক অপরূপ স্পন্দন আনিয়াছেন, তাঁহার নেতৃত্বে দেশের যুবক ও শিশু সম্প্রদায় গুণগ্রাহী মাবুকরী বৃত্তি লইয়া পথভ্রষ্ট জাতীয় জীবনকে মঙ্গলময় রীতিনীতির আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে।

মুসোলিনী ইটালীর ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের নেতা। ফ্যাসিষ্টরা বেশ ভালরূপই বুঝিয়াছে, বালকবালিকারাই দেশের আশা ভরসা—সব কিছুই। দেশের উন্নতি অবনতি তাহাদেরই উপর নির্ভর করে। তাহারাই একদিন বড় হইয়া দেশ শাসন করিবে, সমাজ সংস্কার করিবে—নিজেদের গড়িয়া তুলিতে একটি বিরাট জাতি গড়িয়া তুলিবে। তাহাদের তরুণ মনে এমন কিছু শিক্ষার ছাপ দেওয়া দরকার যাহার দ্বারা ভবিষ্যতে তাহারা দেশে কল্যাণ বহিয়া আনিবে। অপরের চক্ষে ফ্যাসিষ্ট মতবাদের যে রূপই জাগিয়া উঠুক না কেন, তাহারা নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনায় যাহা ভাল বিবেচনা করিয়াছে, সেইরূপ প্রণালীতে ইটালীর বালকবালিকাদের গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে।

ফ্যাসিষ্টরা বুঝিয়াছে, ৬ হইতে ১৪ বৎসরের বালিকারাও রাজনীতি বুঝিতে পারে; ভালোরূপ বুঝিতে না পারিলেও রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক কাজে আসিতে পারে। বালকেরা তো অনেকস্থলে বেশ যোগ্যতাও দেখাইয়াছে।

১৯২৬ সালের ৩রা এপ্রিল ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট "ও. এন. বি" অর্থাৎ 'অপেরা নেজিওনেল বেলিলা" আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই "ও. এন. বি" যখন গড়িয়া উঠিতেছিল তখন ইউরোপের অন্য কোন দেশের কথা দূরে থাকুক, ইটালীর জন সম্প্রদায়ই বিদ্রূপের সুরে বলিয়া উঠিয়াছিল, বলিয়াছিল ফ্যাসিষ্টরা যাহা খুশী তাহাই করুক। দেশের সহানুভূতির অভাবে এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থায়ী তো হইবেই না, ভালরূপ গড়িয়াও উঠিবেনা। আজ যখন তাহারাই দেখে অভিভাবকের বাধা মানে না, গৃহশিক্ষকের শাসন মানে না, বালক বালিকারা আনন্দে উল্লাসে অধীর হইয়া দলে দলে যোগদান করিতেছে—প্রধান প্রধান রাজ পথগুলিতে প্রতি রবিবার দলে দলে সামরিক প্রথায় যাত্রা করিতেছে তখন তাহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া পড়ে, পুরাতন মনের ধারণা বদলাইয়া যায়, অনেকেই আনন্দিত হয়।

'বেলিলা' কথাটি ইটালীর সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। বেলিলা একটি জেনোয়াবাসী বালকের ডাক নাম। সে ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই ডিসেম্বর তারিখে এক অষ্ট্রীয়ান প্রহরী গাড়ীর উপর ঢিল ফেলিয়াছিল। সে সময় জেনোয়ায় অষ্ট্রীয়ার আধিপত্য। এই সামান্য ঘটনা হইতে সমগ্র দেশে ক্রমে ক্রমে এক ভীষণ আন্দোলন জাগিয়া ওঠে। এই আন্দোলন এত দ্রুত গড়িয়া ওঠে যে দেশবাসী ৫ দিনের মধ্যেই অষ্ট্রীয়ানগণকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হয়। সেই অবধি বেলিলা নামটি দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। এখন ইটালীর এই ফ্যাসিষ্ট বেলিলা দল ছাড়া যদি অন্য কোন বালক বেশ রাজনীতি জ্ঞানসম্পন্ন ও জাতীয়তাবাদী হইয়া ওঠে তাহা হইলে তাহাকে লোকে প্রশংসা করিয়া বেলিলা বলিয়া ডাকে।

সাধারণতঃ এই ও. এন. বির চারিটি বিভাগ আছে—বেলিলা, আভাঙ্গার্ডিষ্টি; পিকোল ইটালিয়েন, জিয়োভানি ইটালিয়েন। বেলিলা ৮ হইতে ১৪ বৎসরের বালকদলকে ও আভাঙ্গার্ডিষ্টি ১৪ হইতে ১৮ বৎসরের বালকদলকে লইয়া এবং পিকোল ইটালিয়েন ৮ হইতে ১৩ বৎসরের বালিকাদের ও জিয়োভানি ইটালিয়েন ১৩ হইতে ১৮ বৎসরের বালিকাদের লইয়া গঠিত।

১৯২৬ সালে আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইবার পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ইহার সভাসংখ্যা অতিদ্রুত বাড়িয়া যায়। ইহার সভাপতি রেণাটো রিচি বলিতেছেন, ৮, ৫৩, ৮০১ জন বেলিলা, ৩ ২, ৭৭, ৪০১ জন আভাঙ্গার্ডিষ্টি এবং ৮, ৩১, ৭৭৮ জন পিকোল ইটালিয়েন ও ৮০,০০০ জিয়োভানি ইটালিয়েন এই ফ্যাসিষ্ট অপেরা নেজিওনেল বেলিলার সভ্য হয়।

ইহা গেল ৮ হইতে ১৮ বৎসরের বালক বালিকাদের কথা। যে সমস্ত বালকবালিকার বয়স ৬ হইতে ৮ বৎসরের মধ্যে তাহারাও স্বেচ্ছায় ইহার সভ্য হইতে ইচ্ছুক হইয়া এই ও. এন. বিতে আবেদন করিয়াছিল। তাহাদের ২, ১০,০০০ জনকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল; অবশ্য তাহারা বেলিলা বা পিকোল ইটালীয়েনে যোগদান করিবার অধিকার পায় নাই।

দেশে এই আন্দোলন শিশুদের মধ্যে এমন এক সাড়া আনিয়াছে যে তাহারা প্রত্যেকেই

এই দলভুক্ত হইবার জন্য ব্যগ্র। পাঁচ বৎসরের শিশুরাও আবেদন করিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকে সভ্য হওয়ার অধিকার দেওয়া হয় নাই।

শুধু মার্চ করা বা দলে দলে ক্রীড়াস্থলে যোগদান করানোই এই 'ও, এন, বি'র কার্য্য নহে। তাহারা দেশের বিদ্যালয় সমূহে অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অধীনে যে সমস্ত ব্যায়ামাগার আছে তাহার সভ্য যুবক, কিশোর, বালক বালিকা—সকলেরই উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহারা ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে "অ্যাকাডেমী অব্ ফিজিক্যাল কাল্‌চার" নামক প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতে সমগ্র ইটালীর ব্যায়ামাগার সমূহে ব্যায়াম শিক্ষক পাঠানো হয়। সেই সকল ব্যায়াম শিক্ষকদের সকল প্রকার ব্যয়ভার ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষই বহন করিয়া থাকেন।

সভ্যদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি "ও, এন, বি'র বিশেষ দৃষ্টি। বৎসরের অনেকবার সাধারণ ভাবে সভ্যদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়, রুগ্নদের হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। প্রয়োজন হইলে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাদের পর্ব্বতে ও নদীতীরে প্রেরণ করা হয়।

বালকেরা যখন ১৮ বৎসর উত্তীর্ণ হয়, তখন তাহাদের সৈন্যবিভাগে ভর্ত্তি করা হয়। তাহারা জলযান ও ব্যোমযানের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ পাইয়া থাকে। তাহারা মেকানিক্স, ইলেকট্রো কেমিষ্ট্রী, রেডিও টেলিগ্রাফি, মোটর নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া ওঠে।

সর্ব্বত্রই বেলিলা গৃহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। সেই বেলিলা-গৃহের সহিত ক্রীড়াক্ষেত্র রঙ্গমঞ্চ, পাঠাগার, ছায়া চিত্র গৃহ, বক্তৃতামঞ্চের ব্যবস্থা আছে।

বালক বালিকাদের প্রায় ৯২৭টি প্রতিষ্ঠান আছে। সেই সব প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পুস্তকাগার, সমিতি, শিক্ষাভবন প্রভৃতি আছে। গত বৎসর প্রায় ২৭, ৬৭৯ টি লেকচার প্রদান করা হইয়াছিল। এই সব প্রতিষ্ঠান হইতে নানা প্রকার পত্রিকা, উপদেশপূর্ণ ইস্তাহার প্ল্যাকার্ড প্রভৃতি ছাপানো হয়। দরিদ্র অথচ মেধাবী বালকবালিকাদের কোন অসুবিধা হয় না। তাহারা এই সব প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাইয়া চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, সাধারণ পড়া, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এই সব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বালিকাদের সংখ্যা সকল ক্ষেত্রে বালকদের মত বেশী নহে। কিন্তু যাহাতে তাহারা আরো বেশী যোগদান করে, তাহার জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, পিকোল ইটালিয়েন, বালিকা সঙ্ঘ প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালীকে আরো চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা হইতেছে। একটি বালিকাসঙ্ঘে বহুচেষ্টায় ৫০,০০০ হাজারেরও অধিক সভ্য করা যায় নাই। সেই সঙ্ঘকে ক্রীড়া, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতির দিক দিয়া চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলায় এখন তাহার সভ্য ৭৪,০০০ হাজার দাঁড়াইয়াছে।

মুসোলিনী বলিয়াছেন, ফ্যাসিষ্ট সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ এই "ও, এন, বি"র উপর নির্ভর করিতেছে। সমগ্র দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের সুশিক্ষায় ও সুশৃঙ্খলায় গড়িয়া উঠিয়া সত্যকার মানুষ হইয়া উঠিবে। ইটালীর ভবিষ্যৎ সত্যকার আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

মল্লিকা মধুকরম্

গুণমণেঃ
বিজ্ঞানবিভাগে দ্বিতীয়বর্ষস্থ।

১

নবে বসন্তে নব লব্ধ যৌবনা
স্ব বৈভবা বোধ্য বিলাস হর্ষিতা।
বিলোক্য কাচিন্মধুপং সমাগতং
ব্রুতে সুধাগী র্হসিতেন মল্লিকা ॥ ঃ—

২

" ক ইহ মধুরকণ্ঠ !
ত্বং ঘনশ্যামকান্তে !
ন কৃত পরিচয়স্তু
স্মর্যতে মে ভবাদৃক্ ॥
কথমনুনয়বাগ্ভি
র্যাচিতা তে ভবেয়ং
সপদি সমুপনীত !
স্বাং প্রবৃত্তিং হি দেহি ॥

৩

কুসুম বদন মধ্বা-
দান চাতুর্য্যবৃত্তেঃ
প্রতিদিন নব কান্তা-
প্রার্থিনঃ কিং প্রবৃত্তা ?
ত্বমিহ খলু ষড়ঙ্ঘ্রে !
বেত্মি যেনাগতোঽসি
নবমুখমধুপানৌৎ
সুকা হেয়াস্তকান্ত !

৪

প্রথম মধুজনাত-
প্রোদ্গতং যৌবনং মে
ত্বমপি রুচিরবৃত্তে !
ভোগ্যতাং নেতুকামঃ।

সকৃদপি মম পত্রং
মা স্পৃশ ত্বং ষড়ঙ্ঘ্রে !
শ্রবণমধুরগীতৈঃ
কিং চ তে কামচারিন !

৫

পুনরপি মম পার্শ্বং
বর্ত্তসে লুব্ধচেতো !
হ্রিয়ং তব হত্বা
মে হ্রিয়ং হর্ত্তুকামঃ ।
মধুকর ! গণয়ামি
প্রেম্নাসামান্য ধৈর্য্যং
তব পরিচয় কার্য্যে
জীর্ণ পুষ্পান্তরজ্ঞ !

৬

প্রকৃতি রমৃত পায়িন !
প্রার্থনা পূর্ত্তি রেব
বিকৃতি রিহ চ যাচ্ঞা
ব্যর্থতা,—মন্যসে কিম্ ?
সকৃদপি হৃদি চিন্তাং
স্ববিসৃষ্টা কথং তে
চপল চপল বৃত্তে !
চুম্বিতং বিস্মরামি ॥

৭

শ্রবণ হৃদয় হারি-
ব্যাহৃতস্ত্বং ঘনাভো
ব্রজ কুল ললনানাং
কৃষ্ণকল্পঃ সুখাস্ত্যে ।
বিস্মরসি হৃতচিত্তা
নূনমস্মানজিহ্মা—

ইতি সুখহর চিন্ত
পীড়য়ত্যাগ্রহার্ত্ত !

৮

অপবিত মম সর্ব্বা
ধৃষ্টতা স্তাঃ ক্ষমস্ব
প্রিয়সখ ইতি-কৃত্বা
হ্যুক্তবত্যস্মি যা যাঃ।
ইদমপি মম নূনং
বোধ গম্যং মনোজ্ঞ !
—যদিহ মধুপসঙ্গ প্রেষ্ঠ একঃ
সদা নঃ ॥

৯

—ইতি পরিভবশেষাং
তর্জিতাত্তাঞ্চ বাণীং
বিদিত কুসুম চিত্তঃ
সংনিশম্যৈষনীয়াম্।
গলদমৃতঘনাক্ষ্যাঃ
শান্তবিদ্বাদ্ভ্রবঃ স
ব্যসৃজদনমুকূলং
সঙ্গতঃ সন্ সুগীতম্ ॥

১০

চকোর বৃত্তো বহু ধৈর্য্য ধারণং
সরোজ লোভী ক্ষতকারিকণ্ঠকম্ ।
বিয়োগ দুঃখং মিলিতশ্চ ভুঞ্জতে
সুখং সদা দুঃখ পুরোগমং ভুবি ॥

একনম্বর

শ্রী............দেবী
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।

আজ জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায় বসে এই প্রথম আমার মনে হ'লো যে একটা নম্বরের অত্যাচার চিরদিন আমার সমস্ত সুখ সৌভাগ্য নষ্ট করে দিয়েছে। এক নম্বরের ব্যবধান দুষ্ট গ্রহের মত পদে পদে আমার জীবনের পথে এসে আমাকে পরাজিত, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেছে।

আমার জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এক নম্বর আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। মায়ের কাছে শুনেছি আমাদের ১৭নং বাড়ীর পাশের ১৮নং বাড়ীর জমিদার-পুত্র ও আমি একই দিনে ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। কিন্তু বিধাতার কি নিদারুণ অভিশাপ। এই এক নম্বরের বাধা প্রথম থেকেই আমার জীবনের career নষ্ট করে দিল। তা না হ'লে আজ আমার মত সুখী কে ছিল? জমিদারের ঘরে দুলাল হয়ে টাকার গদীতে বসে নিশ্চিন্ত আরামে জীবনের দিন কটা কাটিয়ে দেওয়া যেতো।

স্কুলে পড়তে গিয়েও এক নম্বরের ক্ষতি আমায় অনেকবারই স্বীকার করতে হয়েছে। কলেজে উঠে দেখেছি যার সাথে Roll no. ছিল আমার একের তফাৎ সেই হ'তো first আর আমার বেলায় grace।

কোন রকমে স্কুল কলেজের হাত থেকে বেঁচেছি। বাঙ্গালীর ছেলে চাকরী না পেলে অন্ন জোটা ভার। তিন বছর উমেদারী করেও চাকরী জোটেনি। তারপরে একদিন হঠাৎ দেখি বিধি প্রসন্ন। ৮নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট থেকে অতুল চৌধুরী দেখা করতে চিঠি দিয়েছেন; সময় বিকেল ৪টা।

যতটা সম্ভব বেশভূষা সেরে নিয়ে ঠিক ৪টার সময় নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর কড়া নাড়তে সুরু করে দিলাম। দারোয়ান এসে দরজা খুলে দিল। বল্‌ল "যাইয়ে জী ওপর মে চলিয়ে"—তারপর আমাকে সঙ্গে করে দ্বিতল অট্টালিকার বাঁ পাশের একটা কামরা দেখিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। দেখলাম দরজার গায়ে ভারী একটা পরদা ঝুলছে, কোনমতে সাহস সঞ্চয় করে পরদা তুলতে গেছি অমনি সম্মিলিত বামাকণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল "হ্যালো মিষ্টার" তারপরেই রকমারি আর্ত্তনাদ। কিন্তু একি! এ আমি কোথায় এসেছি! এখানে অতুল বাবুর অস্তিত্ব ত' নেই-ই পরন্তু তাঁর বদলে যাঁরা আছেন তাঁদের দেখে আমার একেবারে চক্ষু স্থির।

বিরাট চায়ের মজলিস্ বসেছে। কতকগুলো tea tableএর চারদিকে প্রায় দশ বার জন আধুনিক মহিলা নানারঙের শাড়ীর চমক লাগিয়ে সভার শোভা বর্দ্ধন করছেন। একটী সুসজ্জিত আসন কোন সম্মানিত অতিথির অপেক্ষা করছে! কিন্তু সে ভাগ্যবান যে আমি নই এ একেবারে নির্দ্ধারিত। আমি ত' এসব দেখে "ন যযৌ ন তস্থৌ", তরুণীর দল তাঁদের বিস্ময়ের ভাব কেটে যেতেই আমার অবস্থা দেখে কেউ রুমাল মুখে দিয়ে কেউ বা আঁচল চাপা

দিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল। একজন দয়াবতী অনুগ্রহ করে জিজ্ঞেস করলেন "আপনি কাকে চান?" আমি যেন অকূলে কূল পেলাম, বল্লাম! আমি হয়ত ভুল করেছি কিন্তু এটা কি অতুল চৌধুরীর বাড়ী নয়? তরুণীর দল আর একবার হেসে উঠলো। তিনি বল্লেন "এখানে অতুল বাবু বলে ত' কেউ নেই।" আমি বিরক্ত হয়ে তাড়াতাড়ি অতুল বাবুর চিঠিটা তাঁর সামনে ধরে বল্লাম এই দেখুন তিনি আমাকে ৪টার সময় এই ঠিকানায় আসতে লিখেছেন। তিনি উপরের ঠিকানায় একবার চোখ বুলিয়েই মৃদু হেসে বল্লেন, দেখুন আপনারই ভুল হয়েছে অতুল বাবুর বাড়ী ৮নং নয় ৮১নং। চেয়ে দেখি সত্যি ৮এর পাশে কলমের আঁচড় তার শেষ প্রান্তে একটু কালীর চিহ্ন আছে মাত্র।

তারপর অনেক ঘুরে একটা চাকরী পেয়েছি। বিয়ের সময়ও 'এক নম্বর' আমায় কম ফাঁকি দেয়নি। আমার শ্বশুর মশায়ের প্রথম নম্বরের কুরূপা, কলহপ্রিয়া কন্যাটি আমার ঘাড়ে না এসে যদি তাঁর দ্বিতীয় নম্বরের সুরূপা চারুহাসিনী নন্দিনী আমার জীবন-সঙ্গিনী হয়ে যেতেন তাহলে—

যাক্ এসব কথা এখন ভাবাও পাপ।

রবিবার office নেই। নব-পরিণীতা বধূ আবদার ধরেছে তাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে হবে—"ভ্রান্ত"। ৬টার showতে এসেছি, চিত্রায় "সীতা" দেখাতে। Intervalএর সময় একযোগে বাতিগুলো জ্বলে উঠতেই যেন চোখদুটো ঝলসে গেল। হঠাৎ দেখি আমার অনেক দিনের সতীর্থ বন্ধু জগদীশ। চোখে চোখ পড়তেই তৎক্ষণাৎ থেকে সাদর সম্ভাষণ হলো। তারপর সে আমায় টেনে বাইরে নিয়ে গেল, অনেকদিন দুজনে দেখা নেই—সেই কলেজ ছেড়েছি পরে আর দেখা হয়নি। দুজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে অনেক সুখ দুঃখের কথা হ'লো। যখন hallএ ফিরে এসেছি সব আলো নিবে গেছে। অতিকষ্টে নিজের seat খুঁজে নিয়ে পত্নীকে জিজ্ঞেস করলাম "কেমন লাগছে? কতক্ষণ আরম্ভ হয়েছে?" দেখলাম তিনি চট্ করে অবগুণ্ঠিতা হয়ে পড়লেন, ভাবলাম ক্রোধের লক্ষণ—সঙ্গে সঙ্গেই আমার কানে এক প্রচণ্ড খাঁকুনি "কিহে ছোকরা! বলি ভণ্ডামি করার আর জায়গা পেলে না? পনেরো মিনিটের জন্যে বাইরে গিয়েছি এরি ভেতর পরস্ত্রীর সাথে আলাপ জমিয়ে নিয়েছ?" বলে আমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই এমন করে এক ধাক্কা মারলেন যে আমি তিন পাক ঘুরতে ঘুরতে একেবারে দরজার ওপর গিয়ে ছিটকে পড়লাম। ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ হলো। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী আমার অপরাধ দশগুণ বাড়িয়ে বলে একটা বিশ্রী scene create করলেন। কি আর করি বিধাতার লিখন। এবারেও সেই এক নম্বরের বিভ্রাট। একটা seat ছেড়ে বসেই আমার এই দুরবস্থা। আমার স্ত্রী এসব দেখে রাগে দুঃখে বেতস-পত্রের মত কাঁপছিল। একটু পরে আমার কাছে এসে বল্ল "আমার সিনেমা দেখার সখ মিটেছে এবার বাড়ী যাই।" বেরিয়ে এলাম যেন দাগী আসামী।

সেই থেকে ঠিক করেছি আর যাই করি জীবনের বাকী কটা দিন একের কোঠায় হুঁসিয়ার থাকব।

ঋতু ও রাখাল

শ্রীঅনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথমবর্ষ (সাহিত্য)

এক

পশ্চিমের আকাশে নবমীর চাঁদ যখন নিষ্প্রভ হয়ে আসে.....উষার ম্লান অবগুণ্ঠন—ছায়ায় যখন আলোর দেবতা আঁধারের অশ্রুসিক্ত মুখখানিকে বিদায়-ব্যথার ম্লান হাসিতে রাঙিয়ে দেন.....তখন উদাসী রাখাল বেদন রাগিণীর করুণ তানে বিশ্বের দেবতাকে অন্তরের ছন্দে গাঁথা বাঁশী শোনায়। ঘুমন্ত গ্রামের নির্জ্জন পথ দিয়ে সে একা চলে যায়.....দুপাশের বন-ফুলের স্বপ্ন ভেঙে যায়.....ব্যথার শিশিরে তাদের চোখ ভারি হয়ে আসে।

নিঃসঙ্গ বৈশাখী দ্বিপ্রহরে বিশীর্ণ নদীর তীরে বট গাছের তলায় বসে সে বিভোর হয়ে বাঁশী বাজায়.....কালো জলের স্তব্ধ বুকে শিহরণ জেগে ওঠে.....ওপারের চঞ্চল হাওয়া এপারের গাছটীকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।.....

.....গাছের আড়াল দিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে.....রাখাল সেই বহুদিনের পরিচিত পথ দিয়ে আনমনে এগিয়ে চলে.....ক্লান্ত বাঁশীর সুর ভেসে গিয়ে অঙ্গনের সন্ধ্যাদীপের শিখাটিকে চঞ্চল করে তোলে।.....বাঁকের পথে নুয়ে-পড়া বাঁশগাছটীতে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে দেখে পশ্চিমের আকাশ বিদায়-রঙে রঙীন্ হয়ে উঠেছে।

দুই

বনাঞ্চলে কামিনী ফুটে ওঠে.....ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ে বনপথে।.....রুদ্ধ আবেগে শীর্ণ নদী কূলে কূলে গর্জ্জায়। .....বাতায়নের মুক্ত আলোয় ওপারের কালো আকাশ জমাট হয়ে উঠেছে।...বাঁশীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। রাখালের মন—এপারের বাঁকাপথ, স্নানের ঘাট, উচ্ছ্বসিত নদীর বুক, ওপারের ধান ক্ষেত গাছের সার ছাড়িয়ে কালো মেঘের অন্তরালে যে অজানা দেশটী আছে তারই রুদ্ধ দুয়ারে গিয়ে আঘাত করে—তারই ছোট ভাইটী কি সেখানে আছে—যার ডাগর ডাগর দুটো চোখে হাসির বন্যা বয়ে যেতো নিশিদিন।.....মেঘের পর মেঘ এসে আকাশটাকে ঘিরে ফেলে.....।

তিন

শরতের শিউলী ঝরা অঙ্গনে চাঁদ তার শুভ্র হাসিটুকু সঙ্গোপনে পৃথিবীর কাছে পাঠায়।.....সে হাসির মর্ম্মর উচ্ছ্বাসে রাখালের ঘুম ভেঙে যায়..... বাহিরে এসে দেখে দিনের আলোয় ম্লান পৃথিবীর রূপ গভীর রাত্রির স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উছলে পড়ছে।.....তৃণাঙ্কিত অঙ্গনে মুক্ত পৃথিবী আপনাকে অবারিত করে দিয়েছে .....আর তার শিওরে বসে ঝিঁঝিঁ সুরের 'ঝুমুর' বাজাচ্ছে।.....দূরে গাঁয়ের মেঠো-পথের ভাঙা জ্যোৎস্না তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।.....মাচা থেকে বাঁশীটী পেড়ে নিয়ে সে

আঁধারের বুকে মিশে যায়।...পূজাবাড়ীর সপ্তমীর বোধন বাজনা ভোরের পূরবীতে ঘুমন্ত পল্লীর কানে আনন্দের বার্ত্তা এনে দেয়।.....শরৎ এসেছে তার দেশ-জোড়া আনন্দের ডালি নিয়ে।

চার

.....শরৎ বিদায় নিয়ে চলে গেছে।.....ধরার অঞ্চল ভরে উঠেছে সোনালী ধানের শিষে। আলের উপর দাঁড়িয়ে রাখাল আকাশের পানে চায়.....মেঘের অঞ্চল থেকে হেমন্ত সন্ধ্যাকুমারীর রাঙা মুখখানি ঢেকে দেয় ঘন কুয়াসার অঞ্চল দিয়ে। যুগান্তরের বক্ষ ভেদ করে কানে ভেসে আসে.....বৃন্দাবনের সেই সুর-ভোলা বাঁশরীর মর্ম্মরধ্বনি।.....সে ধ্বনি যমুনার স্তব্ধ বুকে ক্ষণে ক্ষণে উজান বইয়ে দিতো।.....যে সুরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেজে উঠতো অনন্তের আকুল আহ্বান।.....শুনে...যে সুরে ব্রজের আকাশ বাতাস স্তব্ধ হয়েছিলো গভীর-বিস্ময়ে।

পাঁচ

...হিমগিরি থেকে উত্তর বাতাস শীত এসেছে জানিয়ে দেয়।.....রাখালের বাঁশী অবজ্ঞে মাচায় গোঁজা থাকে।.....সে ভোর বেলা জাল নিয়ে মাছ ধরতে বেরোয়।.....সারাদিনটা ডিঙিতেই তার কেটে যায়।.....আকাশের নিতানবীন বৈচিত্র্য তাকে আর উন্মনা করে তোলে না।.....সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে আসে.....পাতা জেলে আগুন পোয়ায়।.....রাত্রি ঘনিয়ে আসে।

ছয়

মুকুলের মুগ্ধ প্রাণে কিশোর বসন্ত সোনার কাঠি ছোঁয়ায়।.....বনে বনে শাখায় শাখায় পল্লবে পল্লবে জীবনের মধুর ছন্দ বেজে উঠে নব নব সুরে। বাতাস ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা হয়ে ওঠে.....আকাশ সকাল সন্ধ্যায় নবীন রঙে মেতে উঠে। রাখালের কৈশোর স্বপ্নের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মৃদু মৃদু গুঞ্জন জাগে। মুঞ্জরিত ফুলের পাপ্‌ড়িত পাপ্‌ড়িতে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে যায় তার এই নতুন-পাওয়া আনন্দকে।

.....আবার বাঁশরীর আহ্বান আসে।.....রাখালের অব্যক্ত আনন্দ বেণুর বুক ছাপিয়ে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।.....যে কিশোর-দেবতা একদিন তমাল তলে বিভোর হয়ে বাঁশী বাজিয়েছিলেন.....সেই সুন্দর দেবতা বুঝি আবার তারই কিশোর প্রাণে জাগছেন।..... রাখালের বাঁশী বাজে.....তার মূর্চ্ছনা গ্রামের আঁকা বাঁকা পথ ছাড়িয়ে, বন, কান্তার শ্যামল প্রান্তর, দুরন্ত সাগর পার হয়ে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনন্তের পথে মিশে যায়।.....

আজও যদি কেউ প্রকৃতির বাসন্তী সন্ধ্যায় বাংলার ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত পল্লীর পথ দিয়ে যায়—তাহলে দেখতে পাবে আমাদের মোহন-বাঁশীর অধিকারী সেই রাখাল বাঁকের মুখে পাথরের ওপর বসে বাঁশী বাজাচ্ছে।.....আর চারিদিকের নিস্তব্ধ প্রকৃতি বিস্মিত হয়ে সেই বাঁশী শুনছে—তাকে যদি শুধোয়—ওহে বাহিরের জগৎ দেখেছো কি? সহর দেখনি?.....সে ম্লান হাসি হেসে উত্তর দেবে—'না'—তার অবসর জোটেনি—যুগ যুগান্তের ছন্দ তার প্রাণে মিশে গেছে—শ্যামল বন তাকে বুকে টেনে নিয়েছে—সকাল সন্ধ্যার রক্ত-রবি তার কপালে জয়টিকা এঁকে দিয়েছে.....বনের পাখী তাকে জাগায়, প্রান্তরের রুদ্র দেবতা তার সাথে খেলায় বিভোল!.....

অন্তরতম

শ্যামলেন্দু মজুমদার
২য় বর্ষ (সাহিত্য)

লুকায়ে ঢাকিয়া রাখিয়াছি তোমা
মনের অন্তরালে।
লজ্জা আমার, শঙ্কা আমার
প্রতিপলে অনুপলে।

কবে কোন তানে ভুলে গাওয়া গানে
পড়িবে তোমার রেখা ;
গভীর সে কোন হৃদি তল ভেদি'
তোমারে যাইবে দেখা।

কোন মধুমাসে ফুল মধুবাসে
সুরভিত সমীরণে—
আনমনা আমি তোমারে ডাকিব
স্মৃতি-ভরা জাগরণে।

এত ভয় এত ভাবনা আমার
শান্তি সুষমা হরা ;
বুঝি কোন্ ক্ষণে মূরতি তোমার
আঁখিপাতে পড়ে ধরা।

বারিধির বুকে লুকায়ে রেখেছি
অন্তরতম তলে।
কোরকের মত ঢাকিয়া রেখেছি
আবরিত ফুলদলে।

বাহির আমার কঠিন পাষাণ
তোমারে রাখিতে ঢাকা;
চিত্ত আমার সিক্ত শ্যামল
স্বপন তুলিকা আঁকা।

তুমি ভাব মোরে কঠিন কঠোর
বাহিরের আবরণে—
অন্তর মোর শ্যাম-সুন্দর
সজল বৃন্দাবনে।

কয়েকটি কথা

শ্রীগোবিন্দ রায়
তৃতীয় বর্ষ (সাহিত্য)

"সত্যকে স্বীকার ক'রে রামমোহন তাঁর দেশবাসীর কাছে যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁর মহত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করেছিলেন সেই নিন্দাই তাঁর গৌরব মুকুট। মহাপুরুষ যখন আসেন, বিরোধ নিয়েই আসেন, নইলে তাঁর আসার কোন সার্থকতা নেই।"

—রবীন্দ্রনাথ—

রামমোহনকে শুধু ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক বল্লেই তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় না। তিনি ছিলেন শিক্ষা প্রচারক, ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক, সাহিত্য সম্রাট এবং সর্ব্বোপরি ছিলেন রাষ্ট্রগুরু। তিনি নব যুগের অগ্রদূত—যুগ-প্রবর্ত্তক। ফরাসী বিপ্লবের মুখেই তিনি ঘনান্ধকারময় ভারতের বুকে নেমে আসেন দীপ্ত মঙ্গল প্রদীপ হাতে নিয়ে। কত কালের পুরোন জড়তায় আঘাত করে তিনি দেশে এনে দিলেন নূতন সরস চিন্তা ধারা।

* • • •

হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম রামকান্ত রায়, মাতার নাম ছিল তারিণী দেবী। তাঁর বড় ভায়ের নাম ছিল জগন্মোহন।

বাড়ীতেই রামমোহনের বাল্য শিক্ষা আরম্ভ হয়। গ্রামের পাঠশালায় বাংলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৌলবীর কাছে পারসী ভাষা শিখ্‌তে লাগ্‌লেন। এই ভাষা তখন রাজদরবারে প্রচলিত ছিল। বাড়ীতে কিছু দিন পড়াশোনা করবার পর তাঁর পিতা রামকান্ত মুসলমানী ভাষার কেন্দ্র স্থল পাটনায় রামমোহনকে আরবী ও পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত করবার জন্য পাঠালেন। তখন রামমোহনের বয়স ছিল নয় বৎসর মাত্র। এই খানে তিনি আরবী ভাষায় এরিষ্টটল, ও 'ইউক্লিডের' গ্রন্থ পাঠ করে তাঁর স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধিবৃত্তিকে সুমার্জ্জিত করেন।

তিনি ছিলেন ভাবপ্রবণ। গোড়া থেকেই আকার ও নিরাকার নিয়ে যে সমস্যা তাঁর মনের গোপন দ্বারে ঘা দিয়ে যেতে লাগলো সে সমস্যার মীমাংসা করবার জন্য তিনি হিন্দুর ধর্ম্ম পুস্তক থেকে আরম্ভ করে, বাইবেল এমন কি কোরাণ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অধ্যয়ন করে যেতে লাগ্‌লেন। সুফী কবিদের কবিতা, হাফিজ, মোলারুমি, শামিজ, তাবিজ কবিতা তাঁর বড় প্রিয় ছিল।

একদিন রামকান্ত দেখেন ১৩।১৪ বৎসরের কিশোর রামমোহন নিরিবিলিতে ব'সে যেন কি লিখ্‌ছে। তাঁর কেমন কৌতুহল হল। তিনি রামমোহনের অসাবধানতায় গোপনে

দেখলেন, হিন্দুসমাজের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা। এতে গোঁড়া রামকান্ত দুঃখিত হলেন। তাঁর বংশধরের কাছে তিনি এতটা কখনও কোনদিন আশাও করেননি। এই ঘটনার পর থেকেই পিতা পুত্রের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো, এমন কি পিতা পুত্রের মধ্যে প্রায়ই তর্কবিতর্ক চলতো; ক্রমে সে তর্কবিতর্ক যে মনোমালিন্যের আবর্ত সৃষ্টি করলো, তাতে সত্যনিষ্ঠ রামমোহনের সেখানে থাকা দুরূহ হয়ে উঠলো, তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করে চলে এলেন।

সেই সময় সাধু সন্ন্যাসী দল বেঁধে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁদের সঙ্গে মিশে রামমোহন দেশময় ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। বৌদ্ধদের সম্বন্ধে জানবার জন্য এই সময় তিনি দুর্গম গিরিশ্রেণী পার হয়ে সুদূর তিব্বতে যান। মহাত্মা রামমোহনের অনুসন্ধিৎসু মন সব কিছু জানবার জন্য চির জাগ্রত। সেখানে গিয়ে তিনি বিশেষ বিপদে পড়েন। তিব্বতের সর্ব-প্রধান বৌদ্ধ পুরোহিতকে সেখানে 'লামা' বলে। তিব্বতিরা তাকেই দেবতা বলে পূজা করে। নির্ভীক, দৃঢ়চেতা রামমোহন এই অন্যায়ের প্রশ্রয় কিছুতেই দিলেন না, তিনি প্রতিবাদ করলেন কিন্তু তিব্বতিরা ক্ষেপে উঠলো এমন কি তাঁকে মারবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলো। এই বিপদের সময় তাঁকে কোমলহৃদয়া তিব্বতি রমণীরাই তাঁকে বাঁচিয়ে ছিলেন, তাঁরা না বাঁচালে যে কি হত তা কে জানে। এই জন্য নারী জাতিকে রামমোহন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন।

রামকান্ত ভেবেছিলেন নানা কষ্টে হয়তো রামমোহন আবার ফিরে আস্‌বেন কিন্তু তাঁর সে ভুল ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিছুদিন পরে রামমোহন এসেছিলেন বটে কিন্তু অল্পকাল পরে আবার কাশী চলে গেলেন এবং সেখানে হিন্দু শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেন। ইংরাজী ভাষাও তিনি সেখানেই শিক্ষা করেন।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মনে পাছে আঘাত লাগে তাই তিনি পিতার জীবিতকালে বিশেষ কিছু অগ্রসর হতে পারেন নি। এখন সে পথ মুক্ত হয়ে গেল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মুর্শিদাবাদে অবস্থান করেন এবং সেখানে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাতুল-মুয়াহীদিন' প্রকাশ করেন। এর অর্থ একেশ্বরবাদীদের উপহার।

কুলীন ব্রাহ্মণেরা তখন বহু বিবাহ করতেন, রামমোহনও এর হাত থেকে নিস্তার পান নি। তাঁর তিন বিয়ে। প্রথম বিয়ে অল্পবয়সেই হয়। এবং প্রথমা পত্নী বালিকা অবস্থাতেই পরলোক গমন করেন। তাঁর পিতা আবার তাঁর বিয়ে দেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র নয় বৎসর, এই বৎসরেই রামমোহনের আবার আর একটী বিয়ে দিলেন। রামমোহনের দুইটি পুত্র; রাধাপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদ। পাড়া প্রতিবেশী তাঁর ওপর কম অত্যাচার করেন নি। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ কালে তাঁর বিরুদ্ধ দল যাতে বিয়ে ভেঙ্গে যায় তার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নি। কৃষ্ণনগরের পাশের গ্রামে এক ব্রাহ্মণ যিনি ৪।৫ হাজার ব্রাহ্মণের দলপতির দাবী করেন তাঁর দলের লোকগুলো, প্রত্যুষে তাঁর দরজার কাছে মুরগীর ডাক ডাকতো এবং তাঁর অন্দরে গরুর হাড় ইত্যাদি ফেলে দিত। তিনি নীরবে হিমাচলের মত

মৌনভাবে তাদের সব অত্যাচার সহ্য করতেন; এক দিনও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি। এমনি ছিলেন আমাদের রামমোহন। কলকাতায় থাকতে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে উপাসনা করতে যেতেন, লোকে তাঁর গায়ে ঢিল ছুঁড়তো, সেজন্য তিনি গাড়ীর দরজা বন্ধ করে যেতেন। ঘরে-বাইরে তাঁকে যে কী করে চলতে হয়েছে তা' ভাবলে তাঁর বিশাল মনুষ্যত্বের কাছে আপনি মাথা নত হয়ে যায়। এমনি ছিলেন আমাদের দেশের রামমোহন, দশের রামমোহন।

১৮১৪—১৮৩০ খৃঃ অব্দ এই ষোল বছর তাঁর কর্মযুগ বলা যেতে পারে। এই সময় তিনি কর্মস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে ঈশোপনিষদ্ প্রকাশ করেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে কঠ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ প্রকাশ করেন। শেষটা ছাড়া তিনি সবগুলো ইংরাজীতে অনুবাদ করেন।

ঠিক এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটেছিল—যা' খৃষ্ট সমাজে দারুণ সাড়া সৃষ্টি করেছিল। উইলিয়ম অ্যাডাম নামে এক তরুণ ব্যাপটিষ্ট শ্রীরামপুর মিশনারীতে যোগদান করবার জন্য বিলাত থেকে এসেছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটলো। গোঁড়া ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের ত্যাগ করে ১৮২১ খৃঃ অব্দে একেশ্বরবাদী হলেন, কলকাতার খৃষ্টানরা তাঁকে 'Second fallen Adam' বলে বিদ্রূপ করতো। শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা 'Friend of India' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করে রামমোহনের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলেন। রামমোহনও অদম্য যোদ্ধার মত নেমে পড়লেন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে। তিনি তাঁদের মন্তব্যের জবাব লিখে পাঠালেন, কিন্তু পাদ্রীরা সেই লেখা প্রত্যাখ্যান করলেন। তাতে তিনি কিছু মাত্র না দমে উদ্যমের সঙ্গে নিজেই ১৮২১ খৃঃ 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশ করলেন এবং নিজের মতামত তাতেই তিনি প্রচার করতে লাগলেন। প্রতিপক্ষরা আর তার জবাবের কোন যুক্তি খুঁজে পেলেন না।

অনেক দিন থেকেই তাঁর বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল এবং তার সুযোগও উপস্থিত হল। সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল শোনা হবে বলে তিনি ১৮৩০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। বিলাত যাওয়ার আগে দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইংলণ্ড যাওয়ার সময় তাঁর আত্মীয়েরা সংস্কারের বশবর্তী হয়ে তাঁকে বাধা দিতে লাগলেন, কিন্তু তিনি সে বাধায় একটুও বিচলিত না হয়ে ইংলণ্ড যাত্রার বন্দোবস্ত করলেন। সর্ব প্রথম রাজা রামমোহন রায়ই এই বাধা ভেঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন।

লিভারপুলে কিছু দিন থেকে তিনি 'পার্লামেন্ট রিফরম বিল' ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক বিতর্ক শোনবার জন্য লণ্ডন যাত্রা করলেন। তাঁর আগমন বার্তা শুনে সেখানকার সম্ভ্রান্ত এবং বিখ্যাত সব লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য এলেন। তাঁরা দেখলেন—ভারতের ঐশ্বর্য্য, ভারতের গৌরব, ভারতের মর্য্যাদা, বাঙ্গালী রামমোহনকে আর সবার উপরে দেখলেন—ধর্ম-নিষ্ঠ, উদার হৃদয়, সত্যচেতা, ভারতের যুগ প্রবর্তক, ভারত-সূর্য্য মহাত্মা রামমোহনকে।

দিকে দিকে তাঁর খ্যাতি প্রচারিত হলো। লণ্ডনের উচ্চ শিখরে ত্যাগী রামমোহনের গৈরিক-পতাকা তাঁর বিজয় ঘোষণা করতে লাগলো।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ব্রিষ্টল নগরে 'ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভ' নামে সুন্দর বাড়ীতে অবস্থান করেন। লণ্ডনের অনেক পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে আসতেন কিন্তু তাঁর প্রতিভার কাছে সকলেই মাথা নত করে চেয়ে থাকতেন তাঁর জ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল স্যমন্তক মণির দিকে। এইটেই তার শেষ প্রচার। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বরে তাঁর জ্বর হয়। বড় বড় চিকিৎসকগণ তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই লাগলো। ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবারে, ত্যাগী, ব্রাহ্মর্ষি, ভারতের দীপ্তশিখা ইংলণ্ডে চিরতরে নির্বাপিত হল। একদিন যাঁদের কাছে ছিলেন তিনি চির অজানা, যাঁদের কাছে ছিলেন শত্রু, যাঁরা তাঁকে ঘৃণার বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিয়েছিলেন আজ তিনি আর তাঁদের কাছে অজানা নয়; বিশ্ববরেণ্য মহাত্মা, অজাতশত্রু, ব্রাহ্মর্ষি রামমোহনের নামে সকলে আজও মাথা নোয়ায়, হয়তো আজও তাঁর জন্য সকলে অভাব অনুভব করে।

দেশবাসীর অত্যাচারের বোঝা, লাঞ্ছনা, অপমান মাথার মণি করে ভোলানাথ রামমোহন সেই যে চলে গেলেন, আর এলেন না। আজ তিনি কোথায়—কত দূরে? তা কে বলবে। যাঁকে সেদিন কেউ ধরে রাখতে পারেনি আজ তাঁকে পাওয়ার জন্য এত আগ্রহ কেন?

কলেজ

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী
তৃতীয় বার্ষিক (সাহিত্য)

তৃতীয় বছরে এসে
নৌকা গিয়াছে ঠেসে
ভেঙ্গে বুঝি যাবে নদী মাঝে।
বইটী খুলিলে তবে
বারে বারে মনে হবে
একটী বছর বাকী আছে।
এখন জানিনা হায়
একে একে দিন যায়;
ওরার ও ত এমনি সহসা
একদিন গুণে দেখি
দুই মাস আছে একি
তখন কি হয়েছিল দশা।
সে কথা সমস্ত ভুলে
স্নান করে এলো চুলে
সারাদিন ঘুম দিয়ে যায়।
শীত বায়ু যবে দোলে
সকলে যেমন ভোলে
বৈশাখের দুপুর বেলায়।

কমন্ রুম্-এর লোভে
কলেজে যেতেই হবে
কিন্তু রোজ ক্লাশে কেন যেয়ে
বারে বারে মনে হয়
একাজ মোদের নয়
আগে ছিল ভাল এর চেয়ে।

কতদিন বসে ক্লাশে
ঘুম পায়, হাসি আসে
মনে হয় ক' মিনিট আছে
কোথা বাবা ভোলানাথ
ঘণ্টায় দাও হাত
তা নাহলে প্রাণটা না বাঁচে।

এমন পড়ায় মন
বাড়ী এসে সারাক্ষণ
কলেজের গল্প চলে জোরে।
বাড়ীর লোকেরা ভাবে
সকালে কি খেয়ে যাবে
খেতে হয় আহা কোন্ ভোরে!
ভাল ভাল যাহা থাকে
আহা ওকে দাও আগে
কত বেলা হবে কেবা জানে।
ক্লাশে কিন্তু পাশাপাশি
সারাদিন হাসা হাসি
কিছু কিছু কভু ঢোকে কাণে :—
সেই কর্ণ দিয়ে হায়
অন্য কাণে বাহিরায়
মগজে কি জ্বলে কোনও আলো ?

বাড়ী এসে বলে সবে
শরীর খারাপ হবে
বাড়ীতেই পড়া খুব ভালো!
কলেজ জানেনা হায়
বেঁধেছে যে কী মায়ায়
গল্প গল্প শুধু ক'রে সার।
বাড়ীতে আদর বাড়ে
পরীক্ষার পারাবারে
যতক্ষণ চলে এ সাঁতার॥

যৌবন-মূর্ত্তি রামমোহন

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ (সাহিত্য)

আমার 'কিশোর সঙ্ঘে'র ভাই-বোনেরা,—

তোমরা আজ 'রামমোহন শতবার্ষিক-স্মৃতি উৎসবে'র আয়োজন কোরেচো ; এতে কোরে আমি বুঝেচি তোমরা তাঁকে চিনেচো, তাঁকে জেনেচো, তাঁকে হৃদয় দিয়ে বুঝেচো—তাঁর পবিত্র জীবন কথার কাছ থেকে অনন্ত উদ্যম, অমিত উৎসাহ, বসন্ত-যৌবনের প্রেরণা পেয়েচো ; আরো একটা কথা—কলিকাতার 'রামমোহন শতবার্ষিক-স্মৃতি-উৎসবে'র ছাপাদেখি তোমরা যে কোনো নকল-উৎসবের ব্যবস্থা করো নি, একথাও আমি ভাবতে পেরেচি এই দেখে' যে তোমরা সকলেই তাঁর শিক্ষায়—তাঁর দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হোয়েচে,—সঙ্ঘবদ্ধ হোয়ে কর্ম্মে, ভাবে, প্রেমে, সেবায় কাজ কোরে চোলেচো। রামমোহন তোমাদের আপনার জন,—তোমাদের আত্মার আত্মীয় ; রাজা রামমোহন তোমাদের হৃদয়-সিংহাসনের সত্যিকারের রাজা, যৌবন-শক্তির অমৃত-প্রেরণাদাতা। তাই তোমাদের এই উৎসবে যোগদান করবার গৌরব দিয়ে আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত—আরো সহজ কোরে সরল কোরে বোলতে গেলে,—আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত কোরেচো বোলেই আমার ধারণা।

রামমোহন-পূজোর পুরোহিত যে কেন আমাকেই তোমরা কোরেচো এ কথার অর্থ আর কেউ না বুঝুক আমি বুঝেচি। আমি বিনয় প্রকাশ কোরবো না—সত্যকথাই বোলবো,—তোমরা আমাকে পুরোহিত কোরে শুধু আমাকেই উৎসাহিত করো নি—উৎসাহিত কোরেচো আমার বসন্ত-আত্মার যৌবন-ভগবানকে। 'যৌবনের মধু-প্রাতে'ই তোমরা আমাকে যৌবন-মূর্ত্তি রামমোহনের পূজো করবার সুযোগ দিয়েচো—কেন না তোমরা নিশ্চয়ই জানো—যৌবনই রামমোহনকে চিনবে—যৌবনের গোলাপ-কুসুমেই রামমোহনের হবে প্রকৃত উপাসনা। রাম-মোহনকে আজ শতবৎসর পরে যাঁরা পূজো দেবেন তাঁরা সকলেই যৌবন-শক্তিতে শক্তিমান—এ কথার ভেতর কোনো সন্দেহই লুকিয়ে নেইক'। বাঙলার যৌবনশক্তিই রামমোহনকে চিনেচে। সংকীর্ণতার বাঁধ ভেঙে—গোঁড়ামির বেড়া পার হোয়ে'—জড়ত্বের, ক্লীবত্বের, অন্ধতার অভিশাপকে তুচ্ছ কোরে দুর্বার-বেগে ছুটে চোলেছিলেন যৌবনমূর্ত্তি রামমোহন ; মনে, প্রাণে, আত্মায় বৃদ্ধ যারা, অন্ধতায়, ক্লীবত্বে, জড়তায় বৃদ্ধ যারা—তারা তো চিনবে না রামমোহনকে,—চিনবো আমরা, যারা যৌবনকে বরণ কোরেচি আত্মার অমৃত দিয়ে—যারা যৌবনকে আরাধনা কোরেচি চেতনার গভীর বেদনা দিয়ে—যারা যৌবনকে স্মরণ কোরেচি প্রেম, মৈত্রী ও সেবার সমবায়ে।

সুতরাং বিনয় প্রকাশ যদি কোরি,—যদি বোলে ফেলি—আমাকে পুরোহিতের আসন দিয়ে তোমরা ভালো করোনি বন্ধু, তবে যৌবনের ভগবানকে কোরে ফেলবো অপমান—প্রাণের

শক্তির চেতনাকে করা হবে অযথা অবহেলা। তারচেয়ে বলা ভালো—রামমোহনের উপাসনা কোরবে না কোনো বৃদ্ধ, যার অন্তরে আছে সংকীর্ণতা—আছে গোঁড়ামি—আছে অভ্যুদয়ের হেয় অভিমান, আছে যৌবনের সত্য-ঈশ্বরকে হৃ-দুয়ার গৃহ থেকে বঞ্চিত করবার স্থণ্য স্পর্দ্ধা ও সাহস ; রামমোহনের উপাসনা হবে যৌবনের বেদীমূলে—যৌবনের তপস্যায় ; রামমোহন সজ্জিত রোইবেন যৌবনের হাতে—যৌবনের অমৃত-চেতনার-মল্লিকা-মালে !

রামমোহনকে অনেকে অনেক রকমে দেখে এসেছেন।—স্বদেশপ্রেমিক রামমোহন, বিশ্বপ্রেমিক রামমোহন, মানবমিত্র রামমোহন, নবযুগ প্রবর্ত্তক রামমোহন, বক্তা রামমোহন, রাজনীতিক রামমোহন, সাংবাদিক রামমোহন—এমনিতর কতো কি। একটি মানুষের ভেতর এমন সমগ্রভাবে পরিপূর্ণতা আমি আর কোনো মানুষের ভেতর দেখি নি—এক মহামানব বিবেকানন্দ আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। কিন্তু আমরা রামমোহনকে দেখবো সম্পূর্ণ অন্য ভাবে ; আমাদের রামমোহন যৌবনমূর্ত্তি রামমোহন। আমরা দেখবো সেই রামমোহনকে—যে রামমোহন দুর্বার আকাঙ্ক্ষা—অদম্য শক্তি—অমিত উৎসাহ নিয়ে অন্ধতার বক্ষ ভেদ কোরে—অত্যাচারের জ্বালাময় কণ্টক দলন কোরে উদ্দাম-স্বরে গেয়ে গেছেন আলোকের গান—যৌবনশক্তির গান। আমরা দেখবো সেই রামমোহনকে যে রামমোহন সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে—কুপ্রথার বিরুদ্ধে—ভণ্ডামী ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সিংহশক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন বিপুল বিক্রমে।

পৃথিবীর ইতিহাসের পানে চেয়ে ছাখো একবার। যৌবনের কী অমিত তেজ—যৌবনের প্রজ্বলিত-দীপের কী লেলিহান অগ্নিশিখা। 'জারে'র অত্যাচার কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালালো,—'কাইজর' বন্দীর মত বাস কোরলো সামান্য লোকের মত, আফিম খেলো, বেণীবাঁধা মানব বেশ ত্যাগ কোরে—বেণী কেটে ফেলে রুখে দাঁড়াতে শিখলো,—দাঁড়াতে শিখলো অত্যাচারের বিরুদ্ধে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে—অনাচারের বিরুদ্ধে। শত শত ঘৃণা অবহেলিত পতিত জাতি যেদিন এই যৌবনের মোহনীয় স্পর্শ পেলো—সেইদিনই তারা তাদের অমূল্য আত্মার মূল্য বুঝলো প্রাণে প্রাণে—আত্মায় আত্মায়—হৃদয়ে হৃদয়ে। নিদ্রা তাদের ভেঙে গেল—তাই তো ছুটলো বক্ষ অত্যাচারীর সিংহদুয়ার প্রবল মুষ্ঠাঘাতে চূর্ণীকৃত কোরতে। আমাদের রামমোহন—যৌবনমূর্ত্তি রামমোহন যেদিন জাগলেন—নিখিল ভারতের ঘরে ঘরে গোঁড়ামির সেদিন জেগেছিলো ভীতির স্পন্দন,—টোলেছিলো সংকীর্ণতার আসন—রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ কোরলে পর যেমন ভাবে টোলেছিলো দশস্কন্ধের অটল সিংহাসনখানি।

রামমোহনকে তাই পূজো দিতে যাবার আগে আমরা—নিখিল বাঙলার কিশোর-কিশোরী—যুবক-যুবতীরা—, এই কথা বিশেষ কোরে বুঝলো—তিনি আমাদের, তিনি যৌবনের, তিনি বসন্তের অমৃত-আনন্দ-প্রেরণার। তাঁকে আমরা এই বোলে পূজো কোরবো—:

"যৌবনের-মহাদেব, তুমি তোমার শক্তির, তোমার উৎসাহের, তোমার অমিত উদ্যমের ভীষণ-ত্রিশূল তুলিয়ে অত্যাচার, অনাচার নাশ কোরেচো,—সবের শ্মশানকে

তুমি শিবের নন্দন কানন কোরেছো,—অন্তরের চিত্তানন্দের ওপর তুমি তোমার উদার-উজ্জ্বলতার আসন পেতে যাবে ব্রত রেখেছো অনন্তকাল ধোরে,—তাই তোমাকে পূজো কোরবো—সমস্ত চেতনা দিয়ে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে!

তুমি বুক ফুলিয়ে বোলতে পেরেছো, যে, তোমার "সংগ্রাম শুধুই সংস্কার ও সংস্কার-বিরোধীদের মাঝে নয়,—তোমার সংগ্রাম—স্বাধীনতা ও নির্যাতনের—সুবিচার ও অবিচারের—ন্যায় ও অন্যায়ের সঙ্ঘর্ষের ভেতর মূর্ত্ত হোয়ে উঠেছে"—তাই তোমাকে পূজো কোরবো সমস্ত চেতনা দিয়ে—সমস্ত হৃদয় দিয়ে।"

মরবার পূর্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রামমোহন যৌবনশক্তি সম্পন্ন ছিলেন: অমরায় গিয়েও তিনি নিখিল আত্মায় আত্মায় যৌবনের পেতেছেন সিংহাসন। তাঁর যৌবনের মৃত্যু নেই—যেমন মানুষের আত্মার মৃত্যু নেই। যুগ আসবে—যুগ যাবে—তাঁর যৌবন দিন দিন বর্দ্ধিত হোতে থাকবে নব নব রূপে—নব নব প্রেরণায় আমাদের মাঝে—আগত-না-আসা যুগদেবতাদের মাঝে। তাঁর যৌবন আনবে না কখনও উন্মাদ রস-উচ্ছৃঙ্খলতা—আনবে না কখনও উন্মত্ততার বিপুল বিপ্লব,—তাঁর যৌবন-শক্তি নিখিল চিত্তে চিত্তে দেবে নব নব অমৃত প্রেরণা—যার শক্তিতে অনাচারের, অত্যাচারের লীলা হবে সাঙ্গ—জাগবে স্বাধীনতার—সাম্যের—মৈত্রীর অনন্ত-বসন্ত-গান।

রামমোহনকে কোথায় আমরা দেখেছি? দেখেছি তাঁকে গৃহ-বিতাড়িত হোয়ে বনন-সন্ততিহারার মতো ধূলিসংকীর্ণ পথের পরে। রামমোহন চোলেছেন দুর্বার বেগে যেন কোন অসীমের সন্ধানে। মুখে হতাশার চিহ্ন নেই,—কাল কি খাবেন তার ভাবনা নেই,—ছুটে তিনি চোলেছেন—সত্যের সন্ধানে—শিবের সন্ধানে—সুন্দরের সন্ধানে। রামমোহনকে তারপর আমরা দেখেছি নিতান্ত সহায়হীন অবস্থায় সুদূরে—তিব্বতদেশে। সেখানেও তাঁর যৌবনশক্তি ঘুমিয়ে নেই। সেখানকার ধর্ম্মের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে—ধর্ম্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর অভিযান চালিয়েছেন; তিব্বতবাসী তাঁকে হত্যা কোরতে আসছে,—তাঁর ভয় নেই—কোনো দ্বিধা নেই।

তারপর তাঁকে আমরা দেখেছি তিব্বতবাসিনী করুণাময়ী নারীদের—জননীদের স্নেহের নীড়ে—যেখানে সত্যের সম্মান আছে—শিবের কদর আছে—মহত্তের মর্য্যাদা আছে। সেইখানে তাঁকে বোলতে শুনেছি—"নারি! তোমার প্রতি মানবের অত্যাচার, তোমার প্রতি অনাচার দূর করাই হবে আমার জীবনের ব্রত পণ কোরলাম—আনবো তোমার স্বাধীনতা, আনবো তোমার মহিমাকে সূর্য্যালোকের সম্মুখে। তুমি যে তুচ্ছ নও—তোমাকে কারাগারের জড়তা থেকে মুক্তি না দিলে যে আসবে না মানবের শক্তি—আসবে না জীবনের শান্তি—এই সত্যটিকে উপলব্ধি কোরেছি— মাগো, তোমার শান্তিকুঞ্জে এসে।"

এর পরেই আমরা একদিন রামমোহনকে দেখেছিলাম—সতীদাহ নিবারণ কোরতে—বালিকাবিবাহ প্রথা তুলে' দেবার জন্যে প্রাণপাত কোরতে, কুলীন-কন্যাদের চিরকুমারী কোরে' রাখবার হীন প্রথার বিরুদ্ধে সিংহশক্তি প্রয়োগ কোরতে ॥—

রামমোহনকে আমরা শুনেচি হুঙ্কার দিয়ে এই সত্য প্রচার কোরতে—"ওঁ তৎসৎ—একমেবাদ্বিতীয়ম্"। ঈশ্বর এক, দুই নয়। তেত্রিশকোটি দেবতা নেই' কোথাও। চিন্তা করো সেই এককে—যিনি বহুকে এক কোরে বহুর মধ্যে এক হোয়ে বিরাজ কোরেচেন; যিনি সকলে আছেন—সকল যাঁতে আছে। —তাঁকে আমরা দেখেচি—কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সভাতলে—যেখানে অখণ্ড যুক্তি তর্কের দ্বারা—অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের দ্বারা—সর্ব্বধর্ম্মে গভীর জ্ঞানের দ্বারা সকলেই বিস্মিত কোরচেন—স্তম্ভিত কোরচেন,—নিজের মতে সকলকে টেনে আনচেন, সকলের কাছ থেকে জোর কোরে,' শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ কোরচেন—'এ্যাডাম্' সাহেবকে নিজ-ধর্ম্মে দীক্ষিত কোরেচেন।

ষোল বৎসর বয়সেই গৃহ হোতে বিতাড়িত হোয়ে পথের মাঝখানে এসে তিনি পথের মানুষই হোয়ে গেচেন। তাই তো আমরা তাঁকে বুকে পেয়েচি—আত্মার আত্মীয়রূপে পেয়েচি। তাই তো তাঁকে দেখতে পেয়েচি—যেখানে আর্ত্তের হাহাকার—যেখানে অন্যায়ের বীভৎস রুদ্র লীলা—যেখানে অন্নহারা, আলোহারা মানুষ ক্রন্দন সুরে কাটিয়ে দেচেচে ওই উদার অনন্ত নীলাকাশ, সেখানেই দাঁড়িয়েচেন যৌবনমূর্ত্তি রামমোহন তাঁর অখণ্ড প্রতিভা নিয়ে—বিপুল বীর্য্য শক্তি নিয়ে—আত্মার অবিনশ্বর চেতনা নিয়ে।

দেশে তিনি সমাদর পান নি; বৃদ্ধ, অরাজীর্ণ জগৎ যৌবনের শক্তি ও সাধনাকে স্বীকার করে নি—কিন্তু সত্যের দেবতা তাঁকে আসন দিয়েচেন। তাই তো দেখতে পাচ্চি ভাই—অজ্ঞাতসারেই আমরা তাঁকে পূজো দিয়েচি যুগযুগ ধোরে। যখনি আমরা অন্যায়কে দেখে হুঙ্কার দিয়ে উঠেচি—তখনি তো আমরা তাঁকে পূজো দিয়েচি ভাই। যখনি আর্ত্তের করুণ আর্ত্তনাদ আমাদের আত্মাকে ব্যথিত কোরে তুলেচে—গোঁড়ামির, ভণ্ডামীর, কাপুরুষতার বিরুদ্ধে যখনই আমরা বিষধর 'গোখুরা'র মত গর্জ্জন কোরে ছুটে গেচি—তখনই তাঁকে পূজো দিয়েচি ভাই। তাঁর নাম কোরে—তাঁর নামে সভা কোরে—তাঁর নামে বক্তৃতা কোরে—তাঁর নামে কিছু লিখে পাঠ কোরে তাঁকে যতো না পূজো দিয়েচি তার চেয়ে যে বেশী দিয়েচি বন্ধু—যৌবন-শক্তির উপাসনা কোরে'—"যৌবনের গান" গেয়ে।

এমনি কোরেই তাঁর উপাসনা চোলে আসবে যুগ যুগ ধোরে। এ-পূজো আর শেষ হবে নাকি। যে মধুময়, স্বপ্নময় যুগের দিনের আশায় আমরা শত অত্যাচার—শত অনাচার—শত শত অন্যায় সহ্য কোরচি—সেই অমৃত-যুগ যখন আসবে—যৌবনমূর্ত্তি রামমোহনের সাধনা যেদিন সিদ্ধিলাভ কোরবে—সেদিন সেই অমৃতক্ষণে মহামানব রামমোহন বিদেশের কবর থেকে উঠে আসবেন। মাটির-বুক-থেকে-জেগে-ওঠা জ্যোতির্ম্ময় যীশুর মতন—আমাদের যুগ যুগ

মোরে এই উপাসনা-তপস্যার ভক্তি-অমৃত পান কোরচে। আজ তাঁর শতবার্ষিক স্মৃতি-উৎসব সভায় তাঁকে জাগিয়ে তোলবার পবিত্র উপাসনা আমাদের সুরু হোলো। তাঁকে আমরা জাগাবোই। তাঁকে আমরা আমাদের মাঝে আনবোই একেবারে মুখোমুখী—চোখোচোখি। বিদেশের কবরের তলায় থেকে ও যে প্রেরণা তিনি আমাদের পাঠাচ্চেন—সেই প্রেরণার অমৃত-শক্তিবলে তাঁকে আবার আমরা আনবো আমাদের দেশে—আমাদের গ্রামে—আমাদের গৃহে—সাধনা মন্দিরে। একদিন যে অপরাধ—যে লজ্জা পেয়েছিলাম তাঁকে 'অনাদর কোরে',—চেতনার অশ্রুজলে—তপস্যার বেদনায় তা' ধুয়ে ফেলে আনতেই যে হবে তাঁকে আবার আমাদের মাঝে; নইলে যৌবনের যে হবে অপমান।

তাঁর শতবার্ষিক স্মৃতি উৎসবে আমরা তাই পণ কোরলাম আত্মিক চেতনার সাধনা-মন্দিরে তাঁকে প্রতিনিয়তই আমরা পূজো দেবো—পূজো দেবো যৌবনের শক্তি নিয়ে। তিনি যৌবনের মহাদেব; তাঁর কাছে আমরা দীক্ষা নেব যৌবনের গান গেয়ে। আমরা হবো পৃথিবীর বিস্ময় আমাদের যৌবনকে বিকশিত কোরে; যতো আমাদের জয় হবে—ততো আমাদের 'যৌবনের অভিযান' চোলবে—ততো আমাদের 'যৌবন-বিহঙ্গ' অবিরত গাইতে থাকবে নিঃস্ব মানুষের গান—জয় গাইবে নিঃস্বেশ্বর রামমোহনের। তাঁকে আমরা কখনো ভুলবো না—ভুলতে পারি নাক। যতো আমাদের জয় আসবে—ততো তাঁর স্মৃতি—তাঁর কীর্তি আমাদের আত্মা মাঝে হাসতে থাকবে সদ্য বিকশিত সুগন্ধি গোলাপের মতন।

আজ শত বৎসর পরে তাঁকে পূজো দেবার মতো জাগরণ আমাদের এসেচে। আমাদের এই জাগরণ—তাঁরই কল্যাণে—তাঁরই আলোক-আশীর্বাদে। তাঁর জীবনের আলো—তাঁর তপস্যার আলো আমাদের অন্ধ অন্তরকে আজ উজ্জ্বলোদ্ভাসিত কোরে তুলেচে। আমাদের পবিত্র যৌবনের প্রেরণাকে জাগিয়েচে। আমরা জেগেচি তাঁর আলোকে—কিন্তু তিনি জেগেছিলেন কার আলোর আহ্বানে? ঊর্দ্ধাকাশের ওই যৌবন বিকশিত অরুণ-রবির আলোকে—না, আত্মার উদ্বেজিত আলোক ধারায়?—

আমরা আজ উচ্ছ্বসিত হোয়ে তাঁর পানে চেয়ে আছি। দেখচি আমাদের মানস-নয়নে তাঁর অপরূপ যৌবনমূর্তি; আমরা আর থাকতে পারচি নে তাই তাঁর চির-অমৃত আত্মার উদ্দেশে যৌবনের কৃতজ্ঞতার সঙ্গীত-কুসুম না অর্পণ কোরে'—

আজ মোরা গাহি গান বিশ্বজন কল্যাণের লাগি'
আজ মোরা দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি অবিরত জাগি'
শিখেচি কাঁদিতে বন্ধু! আজ মোরা জানিয়াছি মনে
বন্ধনের শৃঙ্খলেরে না খুলিলে কভু এ-জীবনে

মিলিবে না মুক্তি-শান্তি ; ফুটিবে না শিবের-আলোক
জড়ত্ব-অন্ধতা বুকে ; ফুটিবে না আত্মার পাবক
ক্লীবত্বের-নৈশ মাঝে ; আসিবে না সত্যের মহিমা,
হাসিবে না সীমাবুকে অসীমের অমৃত-গরিমা।

আজ মোরা বুঝিয়াছি প্রগতির শান্ত-আশীর্বাদে—
মানুষের অপমানে মানুষের ভগবান কাঁদে।
আজ মোরা বুঝিয়াছি মানুষেরে অবহেলা করি'
ভগবানে যতো পূজি—তাতে মোরা পাপে চিত্ত ভরি।
আজ মোরা জানিয়াছি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাধনায়
মানুষ সবার বড়ো তার বড়ো কেহ নাহি হায়।
আজ মোরা গাহি গান,—গাহি গান মানবের লাগি',—
মানব-মঙ্গল-তরে তপ করি দিবারাত্রি জাগি'।

তোমার আলোক নাচে—চারিদিকে হাসে আজ ফুল,
আকাশে নীলিমাহাসি উচ্ছ্বসিয়া হোতেছে আকুল ;
চারিদিকে বসন্তের যৌবনের অমিতব্যয়িতা
উল্লসিয়া বিতরিছে আলোকের সান্ত্বনার-গীতা।
তাই আজ জাগিয়াছি ; আমাদের জাগ্রত স্বপনে
হেরিয়াছি নিখিলের অমৃতের অরূপ-রতনে।
আমাদের জাগরণে কীর্ত্তি নাই—গন্ধ কিছু নাই—
সকলে জাগিল, বন্ধু আমরাও সুপ্ত নহি তাই।
নিখিলের বুকে বুকে শতাব্দীর সঙ্গীতের সাড়া—
মোরাও সঙ্গীত-সুরে বাজাতে বসেছি একতারা।

তুমি যবে জাগিয়াছ নিখিলের প্রতি ঘরে ঘরে
অন্ধতার সুপ্তি-প্রেম বিশ্বের সমতা চিত্ত ভরে
পেতেছিলো ক্লীবতা আসন। বন্ধু, তুমি জেগেছিলে
'আলো দাও—আলো চাই'—এই সুরে যবে মেতেছিলে
উন্মাদ আগ্রহভরে—কেহ তোমা দেয় নাই সাড়া
বন্ধন-শৃঙ্খল-শবে ভরেছিলো নিখিলের কারা।
তুমি আলো,—সিংহনাদে অন্ধতার অনাচার হেরি'—
রহিলে না কভু শান্ত ; বাজাইলে সংগ্রামের-ভেরী।

সে এক ভীষণ-যুদ্ধ ; সত্য সাথে মিথ্যার সংগ্রাম।
অভূত—মিথ্যার বন্ধু, সত্যরে নিন্দিয়া অবিরাম
হানিল শরের বৃষ্টি ; সত্য-শিব অভিমন্যু সম
অসত্য-সমরে নিত্য সিংহনাদে,—ওগো প্রিয়তম—
কোরিল ভীষণ রণ ; বন্ধু, যেন কুরুক্ষেত্র-রণ—
সত্যের আসিল জয়—অসত্যের আত্ম-সমর্পণ।
সেদিন সে অভিমন্যু মরে নাই—অসত্য-সংগ্রামে ;
বিজয়ের-পুষ্পরথ আমাদের মাঝে তাই নামে।

আজ মোরা জাগিয়াছি ; বন্ধু, সে ত কল্যাণে তোমার ;
তোমার আহ্বান-যজ্ঞে নিরাকার হোয়েছে সাকার
বিশ্বমানুষের মাঝে। নিঃস্বতার হেয় ব্যাকুলতা
ক্লীবত্বের, ক্ষুদ্রতার বিপ্লবের সুচির ব্যর্থতা
দূরে গেছে। আজ মোরা—
তোমারি বিশ্বের ছেলেমেয়ে—
তোমার বিজয়-গীতি—প্রেমে, কর্মে, শান্ত-সুরে গেয়ে'
চলিয়াছি রুদ্রবেগে সুন্দরের কোরিতে সন্ধান—
সুন্দর আসিবে।
তুমি আশীর্ব্বাদ কোরেছ যে দান! *

* বড়িশা কিশোর সঙ্ঘের "রামমোহন শতবার্ষিক স্মৃতি পূজা উৎসবে" সভাপতির অভিভাষণ। বড়িশা [illegible] বালিকাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে গত ২২শে ডিসেম্বর, শুক্রবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

করুণাময়

শ্রীরাখাল গুরুদাস রায়।
২য় বর্ষ (কলা)

কে খুলিলো
তোরণ দুয়ার ?
চির পরিচিত
চির অজানা—
নূপুর ধ্বনি
বহুদিন শোনা !
দূর-হ'তে-আসা সুরটী তার
যে খুলিল তিমির দ্বার ॥

কণ্ঠে তাহার নিতি যে গো বাজে
সকল সময়
কাজে বা অকাজে !
বিশ্ব জুড়িয়া তাহারি প্রতিমা
গগণে লিখিত কাহিনী তার
যে খুলেছে হৃদয় দ্বার ॥

পবন বহে গো
তাহারি গন্ধ
নদী কল কল
তাহারি ছন্দ,
আমি তুমি ওগো
তাহারি মহিমা,
ফুল বীথি যত
পুলক তার ;—
যে খুলেছে কানন দ্বার ॥

ঘুচিয়া আঁধার
যে দিয়াছে আলো
ভালো ও মন্দে
বাসে সে যে ভালো
দেবতা অসুর
ওসে একই ধার ?
যে খুলেছে বিশ্ব দ্বার ॥

নর্ত্তনে তার
জেগেছে বিশ্ব
ধনী, নির্ধন
জ্ঞানী ও নিঃস্ব
নিশে যাবে সব
তারি পদ তলে
যবে গো থামিবে নৃত্য তার ॥
যে খুলেছে আজি তোরণ দ্বার।

"কাব্য-কণা"

[আমাদের ছোটখাট কাব্য-চিন্তাগুলি "কাব্য-কণায়" গ্রথিত হবে। এবার কতকগুলি বিলম্বে আগামীবারে, আশা করি, আরও বেশী উপহার আপনাদের দিতে পারবো। —সম্পাদক]

"কী প্রলাপ কহে কবি..."

"নীলকুমার"
(৩য় বর্ষ সাহিত্য)

দিনের আলোয় কী যেন একটা কালিমা সেদিন এসেছিল। চারিদিকের প্রকৃতি তার সাথে ঠিকমত তাল রেখে জেগে উঠ্‌তে পারেনি। মনটাও বারবার অভিশাপ দিচ্ছিলো আধ-স্ফুট আলো কে। এ যে সে দেবেই। দেবে না কী? অন্ধকারকে যে কতদিনের তপস্যায় ম্লান ক'রে আজ এইভাবে পরিপূর্ণ আলোতে এসে দাঁড়াতে পেরেচে, তার পক্ষে এই

অনাহূত তমিস্রাকে মেনে নেওয়া যে কত কঠিন তা' নিজেই সে ঠিকমত ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছে না। এক পাশে, পিছনে যা'কে ফেলতে চেয়েছিল—সামনে এসেই সে সে দাঁড়াল; অভিশাপ তবে তার প্রাপ্যই ত'!—সাধারণ বিধান এইভাবে এর বিচার শেষ করে।

ওই ম্লান-হ'য়ে যাওয়া আলোর কথাই আবার শুরু করা যাক্‌। দেবলোকে কী একটা উৎসব চ'লছিল। দেবতারা সব ভুলে তাইতেই মেতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সভাতল আল্পনার চারু-রেখায় চিত্রিত:—লক্ষ্মীদেবীর কোমল আঙুলের সেই পরিচিহ্ন। একদিকে সঙ্গীতকলা দেবীটি তাঁর বীণা-ঝঙ্কারে বাতাসকে প্রাণে প্রাণে আহ্বান ক'রে তাঁকে অনুরণিত ক'রছিলেন। চির-চঞ্চল দেবতা তা'তে আরও উতল হ'য়ে উঠ্‌ছিলেন; কিন্তু আবেশ এসে গিয়েছিল, তাই পা'য়ের ওপর মৃদু-স্পন্দের মত ছড়িয়ে প'ড়ছিলেন। চিরকুমার ঠাকুর তাঁর বাহন বর্হিণ-প্রিয়াকে নিয়ে এসে প'ড়েছেন এবং ভার নিয়েছেন সবাইকে অভ্যর্থনা ক'রে বসাবার। শুভ-লগ্নের ক্ষণটি পাছে ব'য়ে যায় সেই ভয়ে বৃহস্পতি পণ্ডিত ঘড়ি পেতে সময় ঠিক রাখছিলেন। চন্দ্রলোক থেকে চাঁদ এসেছেন—সুন্দর আলোয় সভামণ্ডপ উদ্ভাসিত। ভোজন-উৎসবে অগ্নিদেবের একচ্ছত্র আধিপত্য; কাজেই তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে থেকে প্রসারিত হ'চ্ছিলো। সব-ভোলা, উদার দেবতাটি এমন ভাবে ঢুলছিলেন যে, দেখে মনেই হয় না তিনিই প্রলয় নাচের নটরাজ, রুদ্ররূপী পিনাকী তিনিই। উর্বশী চপলভাবে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—একটু পরেই তাঁর নর্তন শুরু হবে। বড় বিদ্রোহ করেই তাঁর বুকের ওপর মুক্তাহারটি দুলতে থাকবে কিন্তু! কিন্নররা এসেছেন; গন্ধর্বদের তখনও কোন সংবাদ আসেনি। যক্ষপতি দূত পাঠিয়েছেন—হিসেবে গরমিল্; অতএব তিনি উৎসবে যোগদান ক'র্‌তে পারলেন না ব'লে দুঃখিত। সূর্যদেব দু'টি ঘোড়াই রথে জুড়ে চ'লে এসেছেন, একমাত্র কালোটিই র'য়েছে আকাশে। তাই পৃথিবীতে কালিমা।

আয়োজনের ভিতর কোথাও ক্ষুদ্রতম ত্রুটিও দেখা যাচ্ছে না। দেবতাদের হাসি-গল্পে চন্দ্রাতপ গুঞ্জনে ভ'রে উঠেছে। দেখে ভালো লাগে। চোখ দু'টো তৃপ্তি পায় কিন্তু মন যে কেমনি ধারাই বিতৃষ্ণ হ'য়ে ওঠে!

মর্ত্যের কবি তাই ব'লছিল; তোমাদের উৎসবে আমাদের আমন্ত্রণ নেই। তোমরা ওপারের মধু-মাধবীকে বেঁধেছ; আমরা এই হিমানী-গুণ্ঠনে আবৃত হ'য়ে থাকি। আলো তোমরা নাও; শুধু তমিস্রাতলে আমাদের সমাধি রচিত হ'ক।

• • •

আজকের শ্রমিক সেই কবি-বাণীরই প্রতিধ্বনি ধনীর রুদ্ধদ্বারে তোলে না কী?

প্রয়াস

শ্রীঅমলেন্দু মজুমদার
(২য় বর্ষ সাহিত্য)

উপরে অনন্ত আকাশ
নীচে চঞ্চলা নদী।

নদীর ছল্ ছল্ জল উছ্‌লে ওঠে ; আকাশ পানে তার বাণী শোনায়। চায় সে আকাশের বিরাট অন্তরখানি নিবিড় ক'রে পেতে।

আকাশ সে সবার উপর তার ছায়া ফেলে চলে। সবাই তাকে চায়। কা'কে সে বঞ্চিত করবে!

নদী তার রূপের আলো ছড়িয়ে ব'য়ে চলে। তার মন-ভুলান রূপে তাকে পাবার আশায়।

আকাশ শুধু ছায়ায় তার পরশ দিয়ে যায়। আপনাকে আর দিতে পারে না।

নদীর বুকখানা অভিমানে তোলপাড় হ'য়ে ওঠে। শতবাহু বিস্তার ক'রে তাকে বন্দী করতে চায়।

আকাশের আলো নদীর বুকে প'ড়ে চিক্ চিক্ করে মানিনীর মান ভাঙাতে।

নদী তার অভিমান ভুলে যায়। আবার তেমনি কুলু কুলু বয়ে চলে। ডাকে—"এস! এস।"

আকাশ ত তাকে দেয় না কিছু। দেয় শুধু ছায়া! একটুখানি পরশ।

তাই নদীর সম্পদ। হৃদয়ের অন্তরতম দেশে তাকে লুকিয়ে নিয়ে বেড়ায় ; তার রঙে রঙীন হ'য়ে ওঠে।

শিল্পীর সাধনা

শ্রীনীলরতন দত্ত
(২য় বর্ষ, সাহিত্য)

শিল্পী ?......হ্যাঁ সে শিল্পী।......সত্যিই।......

পৃথিবীর সমস্ত গোলমাল থেকে একেবারে দূরে থাক্‌তে সে চেষ্টা করে। তাই একমনে সে তার ছোট্ট ষ্টুডিওটাতে চব্বিশ ঘণ্টা থাকে বসে......কি যেন ভাবে, কি যেন তার নাই... কি যেন তার চাই!......হয়ত' হবে! একটা ফ্রেমে দাঁড় করান [illegible] একটা সাদা ক্যানভাসের উপর তুলি বুলিয়ে নিয়ে যায়,—যেন তাকেই মূর্তিমতী ক'রে পাবার জন্য।......

কে সে? যাকে পাবার জন্য এই ক্ষুদ্র নগণ্য শিল্পীর এই আপ্রাণ চেষ্টা? সার্থক হবে কি? কে জানে?...

ক্লান্ত চোখ মেলে মাঝে মাঝে সে রৌদ্রস্নাত খোলা মাঠের নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখে। তার চিত্ত বিভোর হয়ে ওঠে।.....সাথীরা এক সঙ্গে এসে ডাকে। ডেকে ডেকে ফিরে যায়। সে কিন্তু যায় না। নিজেরই সেই শূন্য ঘরটীতে বসে' আবার ক্লান্ত সে, কোন ক্রমে তার ক্লান্ত তুলিটাকে টান্‌তে চেষ্টা করে।.....

সন্ধ্যা আসে ধেয়ে—মৃদু চরণ ফেলে। আসবেই ত! সে ত আর দেরী করবেনা! সে তখন তার ব্যথা ভরা কালো বড় বড় চোখ দু'টী মেলে আকাশের দিকে তাকায়। কাকে যেন কি জানাতে চেষ্টা করে। পারে কি? কি জানি!.....

ছোট ছোট তারাগুলি যেন ছোট্ট হাত মেলে তাকে ডাকে। ক্লান্ত চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। ভোরের তারা দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে' নিবে যায়।.....সে জেগে ওঠে। কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে উষার রঙে চোখ্‌টা রাঙিয়ে নিয়ে, আবার সে তুলি নিয়ে বসে। তারপর?...

এমনি ক'রে দিন চ'লে যায়।.....

হঠাৎ একদিন সে চম্‌কে ওঠে.....স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মত।.....সে তার সাথীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব'ল্লে.....চল ভাই! আজ আমার সাধনার শেষ। দেখ্‌বে? দেখ্‌বে তার ফল?.....তারপর সে তার সাথীদের দিকে ফিরে সেই ফ্রেমের দিকে কতকগুলো অস্পষ্ট রেখা দেখিয়ে বল্‌লে—এই আমার সাধনা।.....মুচ্‌কে হেসে তারা উঠ্‌ল ব'লে—এত, তাই কতকগুলো রেখা।.....

ব্যথাতুরের মত সে উত্তর দিলে.....প্রিয়ার আমার ওইটুকু ছাপই তুলে নিতে পেরেছিলুম। বেশী আর পারি নিত!.....দীর্ঘনিশ্বাস.....একটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে সেই স্থানটীকে নবজীবন দিলে। দুই এক ফোঁটা অশ্রুও বোধ হয় ঝরে পড়েছিল.....কি জানি?.....

কবি

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় মৌলিক
(১ম বর্ষ, সাহিত্য)

শরৎ আসে শিউলি ফুলের ডালি হাতে ক'রে। মন্দ বাতাস তাঁর গন্ধ মেখে আগমনীর সুর বাজিয়ে দেয়, জানিয়ে দেয় প্রকৃতিকে। কাশের বন গায় বন্দনা-গীতি। ধানের ক্ষেত তাঁর অর্চ্চনা করে স্বর্ণফুলে, নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় মুগ্ধ হয়ে যায় গগন। তোমরা যেন তাঁরই সাথী, তাঁরই অগ্রদূত।.....কবি ভাবে, এই বহির্জগতের আনন্দ ধারার সঙ্গে তার অন্তর্জগতের অভেদ্য মিলন। তার মন হ'য়ে ওঠে আনন্দে আত্মহারা, চোখে ভ'রে আসে জল। সে যেন ভুলে যেতে চায় উভয়ের বিভিন্নতা, সে তা'র কবিতার ছন্দকে এই বাস্তবের অনাবিল রস ধারার সঙ্গে চায় মিশিয়ে দিতে, চায় নব রূপ দিতে, উভয়কে বেঁধে দিতে চায় এক কঠিন বাঁধনে। প্রকৃতির গানে যে সুর বাজে তার ঝঙ্কার যেন সেই কবিতা।

কোকিল গান গেয়ে উষারাণীকে মর্ত্ত্যের আহ্বান দেয় শুনিয়ে, কবি তারে তা'র ছন্দের আবৃত্তি। দিনের শেষে সবিতা দেবতা পশ্চিম গগনে রাঙা আবীর ছড়াতে ছড়াতে কর্ম্মক্লান্ত থেকে ছুটি লয়; কবি এতে পায় অনুভূতি। এই অনুভূতিই তা'র প্রকৃত আনন্দ। বিশ্বজগতকে এই আনন্দের অধিকারী ক'রতে হয় ব্যস্ত। বিহগের কাকলি গান, নদীর কল্লোল তান, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরধ্বনি, সকলেই ফুটিয়ে তোলে তা'র কাছে অসীম আবেগ; নূতন সৃষ্টির ভার তোলে জাগিয়ে, সে যেন পেতে চায় ক্ষুদ্র নগণ্যের মধ্য হ'তেও মহানুভূতি।

বিশ্বজনের জীবনস্রোতের যে চিরন্তনী হাওয়া ব'য়ে যায়, কবি তারে এই-ই তার গানের মর্ম্ম। সুখ দুঃখের অন্তরালে যে শুভ্র প্রহেলিকা ফুটে ওঠে, কবি অনুসরণ করে তার পদশব্দ। মানবের উত্থান পতনের মধ্যে যে চির-সত্যের ছোঁয়াচ লেগে থাকে, কবি ফুটিয়ে তোলে সেই চির সত্য। সংসারের মিলন বিচ্ছেদের, সুখ দুঃখের মধ্যে যবনিকা টেনে দেয় না। সুখ দুঃখকে সুমধুর ক'রে তুলতে চায়। ত্যাগের গৌরবের মহিমা ক'রে কীর্ত্তন। বিরহীকে শুনিয়ে দেয় অনন্ত মিলনের সন্ধান।

তার কবিত্বের সহজ বিকাশ-সাধন আপনা হতেই হয় উদ্ভূত। ছন্দের লালিত্য দ্বারা বিশ্বজনের মন ভুলানো প্রীতির উদ্রেক সে করে না। সংসারের সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হ'তে টেনে নেয় দূরে নিজেকে। উদার ছন্দে সত্যের সন্ধানে পড়ে উন্মাদ হ'য়ে। কবি তার চাঁপা ফুলের মত স্বর্ণ কিরণরাজি আকাশময় মেলে দেয় বিশ্বের শুভ কামনায় আপনার ভাণ্ডার শূন্য ক'রে; শ্রাবণের মেঘ যেমন ক'রে তার বারিধারা দেয় বিলিয়ে, কবিও তেমনি করে তার চিন্তা ধারাকে নানারূপে বিতরণ করে বিশ্বজনকে, আত্মার প্রচ্ছন্ন রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে বিশ্বের মাঝখানে।

মর্ম্ম-উচ্ছ্বাস

'আমার যাওয়া অনেক দূর!'
তরুণ-মন এই বলে।
কী লাভ হায় এই বলাতেই,
বিদায় হবে চোখের জলে!

অ. কু. চ।

বুদ্ধাচিন্ত্য-প্রবোধ-প্রেম সাহিত্য

(সম্পাদক)

আমাদের অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য যাঁদের রচনায় পুষ্ট এবং যাঁরা একে গ'ড়ে তোলার ভার নিয়েছেন (অনেকের সঙ্গে এখানে মতদ্বৈধতা হবে ; তাঁরা "গ'ড়ে তোলা" কথাটার মোটেই পক্ষপাতী নন্। পরে এ বিষয়ে কথা ব'লবো আরো।) তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আরও কয়েক জনের নাম করা যেতে পারে। এঁরা পূর্ণ উদ্যমে বই লিখছেন, ছাপাচ্ছেন এবং বাজারে বিক্রী হ'চ্ছে তা' দুর্ভিক্ষের দেশে যে কোন বস্তুর মত। খাদ্য কিম্বা অখাদ্য এ বিচার নেই। আমরা এই সকল লেখক সম্প্রদায়ের ছোট ছোট সমালোচনা এই সঙ্কীর্ণস্থানে দেবার চেষ্টা ক'রবো। প্রথমেই ধরা যাক্ "বহু-নিন্দিত এবং বহু-প্রশংসিত" বুদ্ধদেব বসুকে ; ইনি বেশ কম বয়সেই লিখ্‌তে আরম্ভ করেন এবং খুব অল্প সময়ের ভেতরই নাম করেন (সুনাম এবং কিছুটা দুর্নাম-ও বটে !)। লেখেন বেশ প্রচুর ভাবে। অর্থাৎ খুব Productive. ইনি বহু-নিন্দিত যেহেতু ওঁর সাহিত্যে এমন সব কথা আছে যা' সকলের কাছে বলা যায় না, পড়া যায় না এবং রুচি একটু মার্জ্জিত হ'লে নিজের-ই তা' মনে ক'রতে ঘৃণা বোধ হয়। প্রাচীনপন্থীরা এবং বাইরে যাঁরা সাধুতার ভাণ করেন তাঁরা ওঁকে নিন্দা করেন। কিন্তু যে কথা সবাই কোন না কোন সময়ে অন্ততঃ মনে করে সে কথা বাইরে স্পষ্ট ক'রে যদি কেউ ব'লে দেয় তবে তার ওপর এত আক্রোশ কেন ? ওর কোন সমর্থন নেই। তবে এ সম্বন্ধেও যুক্তি আছে যথেষ্ট। ক্রমেই আমরা সেই কথা ব'লছি। এঁর চিন্তা ভালগার্, লেখা কুৎসিত ; অতএব নিন্দা ওঁর প্রাপ্য। সেই জন্যই ওঁর বই অনেকেই পড়েন না (মুখে তাই বলেন) ; কেউ কেউ শুধু পড়েন ওঁকে ক্রিটিসাইজ্ করবার জন্যেই মাত্র।—বুদ্ধদেব বহুপ্রশংসিতও বটে। প্রশংসার কারণ ওঁর প্রতিভা আছে মেঘ-ছেঁড়া রোদের মত চক্‌চকে, ধারালো, তীক্ষ্ণ। উনি কন্টিনেন্টাল্ সাহিত্যের সুর, ভঙ্গী, গতি এবং স্পিরিট্‌কে এনে পুরেছেন বাংলার সুরের ভেতরে। ভাষায় আছে ওঁর সূচীভেদ্য দখল। উনি যথেষ্ট পড়াশোনা ক'রেছেন। বাংলা সাহিত্যে যখন নিরাভরণ একটা আবরণ প'ড়ে যাচ্ছিলো এমন সময় ওঁর বিবিধালঙ্কার সজ্জিত ভাষার স্রোত সে অবগুণ্ঠন উন্মোচিত ক'রলে। ওঁর লেখা যখন পড়ি তখন ভাষার রূপসজ্জা (তাই-ই ব'লবো) মনকে বেশ দোলা দেয়, চমৎকার নতুন এবং অতি সাধারণ বস্তুর সঙ্গে খাপ-খাওয়া উপমাগুলি আনন্দ দেয় এবং অতি আধুনিকতা মনকে পীড়িত করে না ; বরং তৃপ্তিই দেয়। বুদ্ধ-সাহিত্য যেন চলমান বিদ্যুৎ ; আবর্ত্তায়মান, স্বচ্ছ বিক্ষুব্ধ নদী। এর উন্মাদনা আছে, গাম্ভীর্য্য নেই ; রূপ আছে, কমনীয়তা নেই ; বিস্ফুরণ আছে, শান্তি নেই।

আমরা বুদ্ধদেবের উপমার নতুনত্ব দেখাবার জন্যে কোন লাইন উদ্ধৃত ক'রে দিলাম না, কারণ বুদ্ধদেবের লেখা যে কোন রচনা পাঠেই তা পাঠকের চোখে পড়বে। এই লেখকের আগের লেখা বইগুলি অপেক্ষা আধুনিক বই "হে বিজয়ী বীর" অনেক ভালো, এবং "যেদিন ফুটলো কমল" ওঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলতে আমাদের একটুও সংশয় নেই। তবে ওঁর চরিত্রগুলি প্রায়ই একরকম। বুদ্ধি-দলিতার মোহ ওঁর কেটেছে, এটুকু মনে হয় এই এতদিনের ক্রিটিসিজমের ফল। ওঁর সাহিত্য সর্ব্ব-সাধারণের সাহিত্য নয়। আমাদের মনে হয় আধুনিক বুদ্ধদেব সাহিত্যিক এবং পূর্ব্বেকার বুদ্ধদেব একটি কু-চিন্তার জীবন্ত কারখানা; তাতে আছে নতুন-আসা, যৌবনের কুশ্রীদিকের ছাপ!

এইবার অচিন্ত্য সেনগুপ্তের কথা। উনি এক কথায় বুদ্ধদেবের ছায়া কিন্তু সে ছায়া প'ড়েছে কন্‌কেভ্ মিরারে! বুদ্ধদেবের যে বস্তু আসে সহজে, সাবলীলে—অচিন্ত্যর তাই লিখ্‌তে হয় যেন জোর ক'রে; অবিশ্যি সব যায়গায় নয় তবে বেশীর ভাগ যায়গাতেই তাই। বুদ্ধদেবের সাহিত্য-প্রতিভা স্বতঃউৎসারিত (তা' সে রুচিসম্মতই হ'ক অথবা নাই-ই হ'ক) কিন্তু অচিন্ত্যর চিন্তা একটু জোর-ক'রে-আনা—তবে, একটা কথা বলা চ'লতে পারে। মধুসূদনের আওতায় প'ড়ে হেমচন্দ্রের যে অবস্থা হ'য়েছিল—অচিন্ত্যর অবস্থাও বুদ্ধদেবের ছায়ায় ঠিক তাই দাঁড়িয়েছে।

প্রবোধকুমার নতুন-সাহিত্যিকদের মধ্যে আর একজন। ওঁর লেখা বেশ ছবিল্ (Picturesque), সহজ এবং গতি সলীল। প্রতিটি চরিত্রের ওপর ওঁর দরদ আছে। ওঁর "কলরবে"র দামিনীকে এই জন্যেই ভালো লাগে এবং "কলরবে"র কল-কাকলীতে, দারিদ্র্যের বেদনাতে, দুঃখের অশ্রুতে সে হারিয়ে যায় না। ছোট গল্প ওঁর মন্দ নয় কিন্তু আজকাল যেন একটু আগের-দুর দেখা হ'চ্ছে। উপন্যাসের মধ্যে "কাজললতা" প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই বিশ্রী এবং শেষ হ'য়েছে রাস্তার ডাষ্টবিনের চাইতেও নোংরা ভাবে। তবে প্রবোধকুমারের "মহা-প্রস্থানের পথে" সত্যিই চমৎকার! এমন লেখা খুব কমই প'ড়েছি। হিমালয়ের পাথরে পাথরে যে কবিতা পাষাণ হ'য়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল, ওর চূড়ার শেফালি-শুভ্র তুহিনে যে সৌন্দর্য্য-লীলা বর্ণ-ব্যাকুলতায় নিত্য লীলায়িত, পথের বেদনায় যে কত মধু থাক্‌তে পারে—প্রবোধচন্দ্রের "মহাপ্রস্থানের পথে" না প'ড়লে জানা যায় না। ওঁর কাছে অনেক কিছু আমরা আশা করি।

আমাদের মতে প্রেমেন্দ্র মিত্র এ যুগের হ'লেও যুগোচিত কোন কিছু (অর্থাৎ ভাবের দিক দিয়ে এবং প্রেরণায়) ওঁর মধ্যে দেখা দেয়নি—কেবল ভাষার দিক ছাড়া। সাহিত্যের গণ্ডীতে যে ক'জন ধরা পড়েন এবং যাঁরা অল্প-বিস্তর নামও ক'রেছেন তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক লেখকদের মধ্যে একমাত্র ইনি-ই শরৎ-পন্থী। এঁর ভাব সুন্দর, ভাষা সুন্দর এবং প্রতিটী চরিত্রের প্রতি থাকে সুতীক্ষ্ণ, দরদ-ভরা দৃষ্টি। আমাদের সাহিত্যের যে ধারা এতদিন চ'লে আসছিলো তার ওপর উনি আধুনিকতার সংস্কার দিয়েছেন অতি নিপুণ হাতে। ওঁর সাহিত্য তাই মনকে এত বেশী নাড়া দেয়। ওঁর সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য-রসে

প্রকৃতির। প্রকৃত সাহিত্য ব'লতে তাই বুঝি যার মধ্যে আনন্দ আছে এবং যে আনন্দ আরও বহুজনের মধ্যে পরিবেশন করিতে পারি, যার মধ্যে সারল্য আছে—অতি সহজে আপনার ক'রতে পারি যাকে; যে বস্তুকে আমাদের পারিপার্শ্বিকতার ভেতর থেকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না এমনিতরো বস্তু যে সাহিত্যের সামগ্রী তাই-ই প্রকৃত সাহিত্য। তা' না' হ'লে কেবল কতকগুলি বাহ্য-আড়ম্বরপূর্ণ বস্তু মোটেই ভালো লাগে না—তার স্থায়ীত্বও নয়। সেই জন্যেই বুদ্ধদেব অথবা অচিন্ত্যর কোন বই পড়ার পর প্রেমেন্দ্রের বই প'ড়লে মনে হয় হঠাৎ বুঝি কাল-বৈশাখীর ঝড়টা থেমে গেল; নারকেলগাছের মাথাগুলি সব শান্ত হ'য়েছে, গাছের নিচের পাতাগুলি সবুজ হ'য়েছে, আকাশের মেঘ থেকে বেরিয়ে-পড়া নিবিড় নীলিমায় রংটা গভীর হ'য়ে উঠেছে। প্রেমেন্দ্র সাহিত্যে গাম্ভীর্য আছে কিন্তু তার রুক্ষতা নেই; তা' ভাব-বিভোর, রসের স্ফূর্তি নেই, কিন্তু উচ্ছল নয়। প্রেমেন্দ্র-সাহিত্যই প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজস্ব সাহিত্য, জাতীয় সাহিত্য।

প্রেমেন্দ্রের ছোট গল্প আমাদের গর্বের বস্তু। এ কথা কাউকে ব'লে দিতে হয় না যে, ওঁর ছোট গল্প চমৎকার। পাঠক আপনা আপনিই তা স্বীকার ক'রে বসেন। "পুতুল ও প্রতিমা"—বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই। বাংলার সৌভাগ্যের এই বইখানিতে যে রূপ দেখা দিয়েছে আমরা সে রূপের ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'ক এই-ই কামনা করি। উপন্যাসেও ইনি সুন্দর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এঁর "মিছিল" এবং নবতম উপন্যাস "উপনয়ন" এঁর প্রতিভাকে আরও সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তুলেছে—সুন্দর শ্রীতে ভরিয়ে দিয়েছে।

এই সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যসেবী অন্নদাশঙ্করেরও নাম করা যেতে পারে। ওঁর ভাষা এবং রচনা ভঙ্গী (style) খুবই সুন্দর। এই দিক দিয়ে উনি প্রতিভাবান্ কিন্তু শুধু মাত্র ভাষা অথবা রচনা পদ্ধতিই সাহিত্যের মূল বস্তু নয়—তার ভিত্তি হ'চ্ছে ভাব। সেই ভাবই অন্নদাশঙ্কর প্রভৃতিতে এত বিকৃত যে তাকে সাহিত্য ব'লতে ইচ্ছে হয় না। এ বিষয়ে উনি একেবারে বুদ্ধিষ্ট। এইখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বিকৃত ভাব মাত্রই আখ্যা পায় "বুদ্ধদেবীয়"। এখন কথা হ'চ্ছে বুদ্ধদেবের ঘাড়েই এ অপবাদ চাপে কেন? কারণ হ'চ্ছে বিদেশী সাহিত্যের মালিন্যটুকুই ওঁর চোখে পড়ে অর্থাৎ ওঁর প্রতিভা তাকে গ্রহণ করে এবং এ বিষয়ে উনিই প্রথম পথাবিষ্কারক। অন্নদাশঙ্করের "পথে প্রবাসে" বঙ্গ-সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ।

• • •

বুদ্ধ-অচিন্ত্য-প্রবোধ-প্রেম-সাহিত্যের যতটুকু আমরা বুঝেছি—তার পরিচয় দিলাম। এখন সাহিত্য কী এবং কোথায় তার সাফল্য নির্ভর ক'রছে, সেইটুকু এখানে ব'লবো।

প্রথমেই একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি: সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের মনের বিভিন্ন ধারাগুলি। মানুষের দৈনন্দিন কর্ম, চিন্তা প্রভৃতিই সাহিত্যের মূল বস্তু। সেইজন্যেই মার্কিন্ কবি হুইট্‌ম্যানের কথাটা বেশ সত্যি ব'লে মনে হয়:

Comrade, this is no book ;
Who touches this, touches a man—

শুধু এই একটিই নয়। বহু লেখক, বহু সমালোচক—কত রকমভাবে সাহিত্যের সংজ্ঞা (definition) দিয়েছেন। টমাসনের মতে "It is a record of the best thoughts." ইস্‌ফোর্ড ব্রুক্‌ ব'লেছেন, "By literature, we mean the written thoughts and feelings of intelligent men and women arranged in a way that shall give pleasure to the reader." শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির ভেতর দিয়ে মানুষ করে সুন্দরের দেবতার পূজা এবং তার মধ্যে থাকে তার নিজের একটা চেষ্টা অমর হবার, অমৃত হবার।

সাহিত্য সৃষ্টির মূলে আছে ওই প্রচেষ্টা। এখন এইটাই সবখানি নয়। সাহিত্য গ'ড়ে ওঠার গোড়ার রাজনৈতিক কারণ এবং অবস্থাও উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের আজকের সাহিত্য-ইতিহাস তাই-ই প্রমাণ ক'রুচে। যখন আইরিশরা ইংরেজ সম্পর্কবিহীন একটা সাহিত্য রচনায় মন দিলে সেই সময়ই হ'ল Celtic Revival. চীনা-সাহিত্যেও, যখন এমনি ধারা রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ঘ'টেছে, এই রকম বহু পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। প্রত্যেক দেশে, সর্ব্বকালে এই বিধান চ'লে এসেছে।

এই ত' গেল' সাহিত্য এবং তার সৃষ্টির কথা। এইবার কোথায় তার সাফল্য নির্ভর ক'রচে তাই ব'লবো। সাহিত্যের প্রধান বস্তু হচ্চে "Great Manner" এবং তা' "গ'ড়ে ওঠে তার চিন্তার immensityর ওপর।" সাহিত্যের সাফল্য এর (অর্থাৎ সেই সাহিত্যের) চিরন্তনীতার ওপরও বেশ অনেকটাই নির্ভর করে।

আগেই ব'লেছি সাহিত্য, শিল্প, এগুলি সুন্দরের পূজা সূচিত করে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য সেই সুন্দরকেই ক'রচে উপেক্ষা। এ যেন আঘ্রাত ফুল দেবতার পায়ে দেওয়া হ'চ্চে দেবতাকে উপেক্ষা ক'রেই। ভক্তি নেই, আছে স্বার্থ। তাইতে হ'লো, যাঁকে অর্ঘ্য প্রদান করা হ'চ্চে তাঁর করা হ'ল অপমান আর অর্ঘ্যের সামগ্রীর মূল্য গেল' অনেকটাই ক'মে; কুসুম এল' ম্লান হ'য়ে। তবে এটা স্বীকার ক'রতেই হবে—উৎসর্গের ভঙ্গি বড় চমৎকার! চোখের তৃপ্তি আছে।—আধুনিক সাহিত্য থেকে এই কথাই বোঝা যায়।

ওপরে যে কথাগুলি বলা হ'ল তার সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য মিলিয়ে দেখ্‌লেই কোথায় এর গলদ চোখে প'ড়বে। দু' একজন ছাড়া এঁদের কারুরই স্বকীয় চিন্তা নেই; চিন্তার ওপর প'ড়েছে বিদেশীর-ছাপ, তাই গভীরতা ক'মেছে, চাকচিক্য বেড়ে গেছে।

আমাদের নতুন সাহিত্য যদি বুদ্ধদেবের ভঙ্গি (style) এবং প্রেমেন্দ্রের মার্জ্জিত চিন্তা গ্রহণ করে তবে বেশ ভালো ফলই হবে ব'লে আমরা বিশ্বাস করি।

এই পর্য্যন্তই সাহিত্য-কথা।

* * *

সম্পাদকীয়

আমাদের শিক্ষা

যে শিক্ষাধারা আমাদের প্রচলিত র'য়েছে এযে আমাদের অনুকূল নয় এ কথা আমরা বুঝেছি মাত্র এই অতি অল্প ক'দিন এবং যেদিন থেকে বুঝেছি সেদিন থেকেই চেয়ে আস্‌ছি এর সংস্কার। ফলে অবিশ্যি কিছুই পাইনি।

আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল এক রকমের; তা' আমাদের চতুর্বর্গের মধ্যে একটি প্রকৃষ্ট ফল প্রদান ক'রতে—সেটি ধর্ম্ম এবং জ্ঞানমার্গ থেকে মোক্ষলাভ করা। আধুনিক শিক্ষা অর্থ প্রদানকারী। তবে কথাটা যদি আরও একটু বিস্তৃত অর্থে নেওয়া যায় তা' হলে দেখা যাবে যে অর্থকরী হ'লেও প্রকৃতপক্ষে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বেকার-বেকারী!

একটা সময় ছিল, বছর ৩০।৪০ আগে, যখন ডিগ্রীগুলো ভীষণভাবে বেশী দামে বিক্রী হ'য়েছিল। মানে, বাজার ছিল ভালো; সেয়ারগুলো আসল দামের ওপরেও শতকরা বেশ মোটা হারেই উপরি দাম পেয়েছিল। কিন্তু এখন বাজার গেছে নেমে, মোহ উঠেছি কাটিয়ে; কাজেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীর আর সেকাল নেই। এবং নেই বলেই এম-এ আর আই এ তে হ'য়ে গেছে একাকার। মাঝখানে থেকে বি, এ, র হ'য়েছে অবস্থা সাধারণ মধ্যবিত্তের মত। মধ্যবিত্তেরা যেমন কথায় কথায় ভিন্নে চাইতে লজ্জা পায়, তেমনি লজ্জা পায় ধনীর সঙ্গে সমান তাল রাখতে। তবে লজ্জা যতটা না পায় তার চাইতে বেশী পায় নিজের আর্থিক অবস্থার কাছে থেকে একটা বিপরীত মুখী টান্। গ্রাজুয়েটদের অবস্থাও ঠিক ওই রকম। একটা চাকরির জন্যে যেখানে শুধুমাত্র আই, এ পাশ চায় সেখানে ওদের যেতে হয় লজ্জা আর যেখানে এম-এ প্রয়োজন সেখানে ওদের কোন স্থানই নেই। (আজকাল অবিশ্যি সব হ'য়ে উঠেছে মরীয়া তবু অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়নি একটুও)।

ওপরে যে কথাগুলি বলা হ'ল সকলেই তা' জানেন। প্রধান কথা হ'চ্ছে, এর পরিবর্ত্তন কোনদিক নিয়ে হ'লে তবে সব সহজ হবে। আমাদের মতে এইগুলি প্রয়োজনীয় মনে করি:—

(১) স্কুল এবং কলেজের সময় অন্যরকম ভাবে হওয়া উচিত। ১০টা থেকে ৪টে আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। সেই জন্যেই বেশীর ভাগ ছাত্রের স্বাস্থ্য খারাপ। সময়টা সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৪টে পর্য্যন্ত করা উচিত। অবিশ্যি মাঝে মাঝে খাওয়ার জন্যে, স্নানের জন্যে ছুটী থাকবে। এরকম ক'রলে খেলা-ধুলা, ব্যায়াম ইত্যাদিরও কোন অসুবিধে হবে না।

(২) পড়ার বিষয় আরও বাড়িয়ে দিতে হবে এবং তার মধ্যে প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ভাবে সব করার জন্যে সময় বেশী চাই, থিওরিটিক্যালের চাইতে।

(৩) ম্যাট্রিকুলেশনের পরই যার যার রুচি এবং পারদর্শিতা অনুযায়ী বিষয় পড়বার সুবিধে দিতে হবে।

কথাগুলি ভাবতে এবং লিখতে খুবই সহজ মনে হ'চ্চে কিন্তু কাজে নাম্‌লেও খুব কঠিন মনে হবে না।

* *

এম্, সি, সি।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট্‌দল। উত্তর ভারতে অনেক যায়গায় খেলে পূর্বভারতে এসে দেখা দিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত সমান সমান হ'য়ে (অর্থাৎ ড্র করে) পাড়ি দিলেন বারাণসীতে। সেখানে আর টিঁকতে পারলেন না—হাজার হ'লেও ভোলা ঠাকুরটার সাপগুলির বিষ আছে বটে। এমন বিষ ঢাল্‌লে যে অমন দারুণ দারুণ ব্যাট্‌স্‌ম্যান্‌রা'ও বলকে মেরে হটিয়ে দিতে পারলে না। এম্, সি, সি-কে ব'লতে ইচ্ছে হ'ল : এঃ, ছি, ছি !!

যাই-ই হ'ক কলিকাতায় সে ক'দিন কাণ পাতবার উপায় ছিলনা। মাঠে ত' বেজায় ভিড়! ট্রাম, বাস্ সব বাস্ বাস্ ডাক ছেড়েচে। যারা খেলা দেখতে যায় তারা ত' রোদে আর ধুলোয় মৃতপ্রায়, তাদের চাইতে যারা শোনে আর কাগজ পড়ে তারাই চেঁচায় বেশী! কী আশ্চর্য্য!

* *

ভূমিকম্প

কী ভীষণ ভূমিকম্প! পাটনা, মজফরপুর, মুঙ্গের ও আরও অনেক দেশের সর্ব্বনাশ হয়েচে দৈবদুর্ব্বিপাক একেই বলে!

***

অনেকগুলি সাহায্যভাণ্ডার খোলা হ'য়েচে মরণাপন্ন দুঃস্থদিগের দুঃখ দূর পরিকল্পনায়। দেশবাসী গভীরভাবে আর্ত্তের বেদনা বুঝতে পেরেচেন এবং তাঁরা অর্থে, সামর্থ্যে এদের সাহায্য ক'রচেন। আমাদের কলেজ ইউনিয়নের সুযোগ্য সেক্রেটারী সরস্বতী পূজার আমোদ প্রমোদ-গুলি বাদ দিয়ে পূজা-ফাণ্ড থেকে পঁচিশ টাকা "মেয়র ফাণ্ডে" দিয়েছেন এবং আরও একটি ফাণ্ড কলেজে খোলা হ'য়েচে। তাঁকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্চি। আত্মীয়-বন্ধু-বিয়োগ-বিধুর সকলকে আমাদের গভীর সহানুভূতি জানাচ্চি।

***

এডিটোরিয়্যাল-বোর্ড

আমাদের গত-সংখ্যায় "মহিলা বিভাগ" নাম দিয়ে আলাদাভাবে কেবলমাত্র ছাত্রীদের-ই রচনাগুলি ছাপা হ'য়েছিল। কলেজের সকলেরই চোখে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশ ঠেকেছিলো—

আমরা কেউ-ই একে মেনে নিতে পারিনি। কাজেই এবার আমরা মহিলা-বিভাগের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট মিস্ মিত্রকে এবিষয়ে ভেবে দেখবার জন্যে অনুরোধ ক'রেছিলাম। আমরা ব'লেছিলাম: একই বাড়ীতে থেকে এমন ভাবে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করা চলে না। ওঁদের যদি কোনরকম অনিচ্ছা থাকে পুরুষদের রচনার পংক্তিতে নিজেদের রচনা ছাপাতে—তবে ভিন্ন-ভাবেই তা' করা হ'ক। একই প্রাঙ্গণের মধ্যে এমন ভাগা-ভাগির ব্যাপার আমরা ক'রতে দেব' না।—পরে তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন যে মেয়েরা সকলেই রাজী আছেন "মহিলা-বিভাগ" তুলে দেবার পক্ষে। আমাদের নব-গঠিত "এডিটোরিয়্যাল্ বোর্ডে"ও তিনি নিজে এসেও ওঁর প্রতিনিধি শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীকে পাঠিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রেছেন।

ব'লে রাখা ভালো যে সম্পাদকযুগল নিজেদের কাজের সুবিধার জন্যেই এর সৃষ্টি ক'রেছিলেন।

* *

সাহিত্য-সমিতি

কলেজে একটী সাহিত্য সমিতি গঠন করা হ'য়েছে। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীতারিণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন। আমরা নিমন্ত্রণ-লিপি ছাপা হ'য়েছে ব'লে শুনেছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন অধিবেশন হ'য়েছে ব'লে শুনিনি আশা করি, শীঘ্রই হবে। আগামী বারে এ সম্বন্ধে কিছু বলা যাবে নিশ্চয়ই, কারণ সম্পাদক দ্বয়ের ওপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তাঁরা একে সাফল্য মণ্ডিত করতে পারবেন।

*

সরস্বতী পূজা

আমাদের সরস্বতী পূজা বেশ ভালো ভাবেই হ'য়ে গেছে। আমরা আলোর দেবীর কাছে সকল অন্ধকার দূর ক'রে দেবার জন্যে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছি। তিনি শুনবেন নিশ্চয়ই!

* *

আমাদের পুরাতন বন্ধুগুলি আসন্ন আই, এ, আই, এস্, সি; বি, এ; বি, এস্, সি পরীক্ষার জন্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠবেন। তাঁদের সকলের সুখ সাফল্য কামনা করি।

নানা কারণে কাগজ বেরোতে এবার দেরী হ'য়ে গেল; আশাকরি সেজন্যে ক্ষমা পাবো।

* *

*

শোকাশ্রু

আমাদের কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১লা ফেব্রুয়ারী ইহলোক ত্যাগ ক'রেছেন। অধ্যাপক হিসাবে এবং ছাত্র-বন্ধু ভাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন ক'রেছিলেন। আমাদের কলেজের প্রতি কাজের (যেমন :—কলেজ ইউনিয়ন, ম্যাগাজিন, জিম্‌নাসিয়াম প্রভৃতি) সঙ্গেই তাঁর স্মৃতি জড়িত। তিনি এই কলেজে ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত অধ্যাপকতা ক'রেছিলেন। তাঁর মত একজন সুপণ্ডিত এবং ছাত্র-বৎসল অধ্যাপক হারিয়ে ছাত্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল—সন্দেহ নেই।

আমরা শোক সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন ক'রছি।

* *
*

কৈফিয়ৎ

গত সংখ্যায় শ্রীমতী সোম লিখিত একটি রচনা প্রকাশিত হ'য়েছিল—"শিকার গোড়া-পত্তন।" উক্ত গল্পে একটি চরিত্র ছিল যিনি পূর্ব্বে সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন কর'তেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত কার্য্য-কলাপ বাঞ্ছনীয় ছিল না—গল্পটিতে এই রকমই তাঁর চিত্র অঙ্কিত করা হ'য়েছে। এই কথা নিয়ে সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজের কোন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র আমাদের লিখে পাঠিয়েছেন যে, এতে ক'রে না-কী তাঁদের অপমান করা হয়েচে।

লেখিকা আমাদের জানিয়েছেন যে তাঁর ওরকম কোন উদ্দেশ্য ছিল না। গল্প নিছক-ই গল্প।

আমরাও ওই মত পোষণ করি।

* *
*

ইণ্টার কলেজিয়েট্ স্পোর্টস্

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ইণ্টার কলেজিয়েট্ স্পোর্টস্ হ'য়ে গেল এবং আমাদের কলেজ থেকে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী (বিজ্ঞান বিভাগের) শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার বসু এবং প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর (বিজ্ঞান বিভাগের) শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ী বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুশীল বাবু নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন :—

(১) পুটিং দি সট্
(২) জ্যাভেলিন্ থ্রো
এবং (৩) ডিস্কাস্ থ্রো।

অমলেন্দু বাবু পোল্‌ভল্টে প্রথম হ'য়েছেন। ওঁর রেকর্ড হ'চ্ছে ৯' ৯"।

সুশীল বাবু "লেডি আরউইন চ্যালেঞ্জ কাপ" এবং অমলেন্দু বাবু "কাশিমবাজার চ্যালেঞ্জ কাপ" পেয়েছেন। এঁরা পাটনায় যাবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন।

আমরা এই বিজয়ী বীর যুগলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন ক'রছি এবং পাটনাতেও এঁদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য প্রার্থনা করি। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আরও খবর দেবো।

রাজা রামমোহন

আমরা আমাদের অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা-আনন্দ মিশ্রিত পুষ্প তুলে দিলাম **দেশাত্মা** রাজা রামমোহনের লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশে :

হে সুন্দরের সত্যসুন্দর !

আমাদের সমাজে যখন কুটিলতার কালো ছায়া নেমে এসেছিল,—শিক্ষায়, সভ্যতায় আমাদের দৈন্য যখন হ'য়ে উঠেছিল আকাশস্পর্শী, সেই মৃত্যুম্লান মহা-তমিস্রায় তোমার কল্যাণময় জাগরণ ! তুমি আমাদের জাতীয়তাকে উদ্বোধিত ক'রেছ, ঐশ্বর্য্যে ভরিয়ে দিয়েছ দীনতাকে ; সমাজের সঙ্কীর্ণ মর্মমূলে আঘাত ক'রেছ বজ্রের মত দৃঢ় ক'রে !—যা'কে সত্য ব'লে, সুন্দর ব'লে জেনেছ, তা'কে তুমি হৃদয়ের অর্ঘ্য অঞ্জলি দিয়েছ ! হে সত্যসুন্দর ! আমাদের পূজা গ্রহণ করো !

হে শিক্ষার ভাস্বর-শিখা !

তোমার মাঝে সমন্বয় ঘ'টেছিল বহু-ভাষার। তোমার শিক্ষা তোমার সামাজিক সঙ্কীর্ণতার, ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম ক'রে তোমাকে যে লোকে উন্নীত ক'রেছিল—সেখানে ছিল একটিমাত্র বাণী !—তার নাম সত্য। তোমার সে শিক্ষাকে আমরা প্রণাম করি !

হে জ্ঞানাঞ্জন !

তৃষ্ণা হীনতায় যখন দৃষ্টিনয়ন অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল—শক্তি ছিল না সত্য-মিথ্যাকে চিনে নেবার, সেই সময় তুমি এসেছ তোমার জ্ঞান-বর্তিকাটি হাতে ক'রে ! অন্ধ-নয়নে দৃষ্টি দিয়ে এসেছিলে ; কিন্তু তখন তোমাকে চিনতে পারিনি—তাই হ'য়েছিল তোমার অপমান, সত্যের অপমান। কল্যাণকে উপযুক্ত আহ্বান করা হয়নি। হে ক্ষেমঙ্কর ! সে অপরাধের যথোপযুক্ত শাস্তি ত' পেয়েছি। তুমি ক্ষমা ক'রো। আমাদের অনুতাপের নয়ন-বারিতে তোমার অপমানের ক্ষালন হ'ক !

হে প্রিয়-পূজারি !

আমাদের মূক কণ্ঠে তুমি-ই ত' প্রথম ভাষা এনে দিয়েছ—মুখর ক'রেছ নীরব কণ্ঠকে ! বঙ্গভাষা তোমার কাছে জন্ম-জন্মান্তর ঋণী থাকবে আর সেই সঙ্গে বঙ্গদেশবাসীও ক'রবে তোমার কল্পমূর্তির ধ্যান !

হে রাজা রামমোহন!

ত্যাগে, কর্ম্মে, মনিষায়, করুণায় তোমার জীবন উৎসর্গিত হ'য়েছিল। দীনের দুঃখে, নারীর অবমাননায়, শিক্ষার পঙ্কিলতার জন্য তোমার বেদনার আর্ত্তিতে পূর্ণ হ'য়েছিল; তাই তুমি সাগরে, সৈকতে, দেশে দেশান্তরে ঘুরেছিলে সত্যের সন্ধানে আমরা সে কথা বুঝিনি— তাই তোমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রেছিলাম।

জানি, তুমি আমাদের ক্ষমা ক'রেচ তবু আজ শ্রদ্ধাপ্লুত হ'য়ে তোমার শতবার্ষিক জন্ম-বাসরে দাঁড়িয়ে তোমার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি আর প্রার্থনা করি তোমার বিপুল সম্প্রসারণ আমাদের নব-জাতীয় জাগৃতির দিনে।

সত্যম্—শিবম্—সুন্দরম্।

❊

রাজা রামমোহনের শত-বার্ষিক জন্ম উৎসব হ'য়ে গেল, ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে। সুখের বিষয় সন্দেহ নেই। জাতি আজ আপন অধিকার বুঝতে পেরেচে তাই সে তার অতীতের আদর্শকে পূজা ক'রতে পারচে। আমরাও আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি সেই পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু একটা কথা আমাদের বড় পীড়িত ক'রেচে। ছাত্র-ছাত্রীরা যখন তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন ক'রছিলেন বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজ থেকে সভা আহ্বান ক'রে সেই সময় শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থিনী হিসাবে আমাদেরও একটা ন্যায্য অধিকার ছিল সে উৎসবে যোগ দেবার। অথচ ভুলেও আমাদের আহ্বান করা হয়নি। এর মূলে আর যাই-ই থাক্ উদারতা ছিলনা। একে আমরা ক্ষমা ক'রতে পারিনে।

❊

ভ্রমসংশোধন

"এডিটোরিয়্যাল্ বোর্ড" ব'লে যে নামটি ভুলক্রমে ছাপা হ'য়েচে বস্তুতঃ তার নাম "এডিটর্স্ এড্‌ভাইসরি বোর্ড।" পাঠকগণ অনুগ্রহ ক'রে ওটুকু শুধ্‌রে নেবেন।—সম্পাদক।

ASUTOSH COLLEGE

MAGAZINE

Vol. X. | January 1934 | No. 2

A Face

Jatish Chandra Kundu (1st. Year Arts.)

"I know a face, a lovely face,
As full of beauty as of grace;
A face of pleasure, ever bright,
In utter darkness it gives light.
A face that is itself like joy;
To have seen it I am a lucky boy;
But I have a joy that has no other,
This lovely Woman is my Mother."

The Bengali Neo-Romantics

By Prof. Mohinimohan Mukherjee, M.A.

THE sledge-hammer strokes of the conservative school of criticism have been applied only too often against the ultra-modern school of writers in Bengali, though no honest and dispassionate attempt has been made so far to understand their viewpoint. Even legal aid had to be taken against some of their thrillers on the specious pretext that they would "corrupt the young," a plea that goes back to the days of Socrates. The best form of literature cannot transcend the *milieu*, and even the Homeric sagas could not overcome the spirit of the age. We have no evidence on record that the literary or rhapsodic presentation of the abduction of Helen was ever hauled up before any Achaean police court, or a shrewd purist of the type of Ulysses even raised a finger of protest against the immorality *per se* of Paris, because the Greek princes actually led out the great expedition against Troy for a mere idea to redeem the pledge they had made on the eve of Helen's marriage.

The plea of morality has received a veneer of sanctimonious stamp with the increasing sex-complex from which modern civilization suffers. The charge against the Bengali neo-romantics is that they are much outspoken; that they paint life as it is, gloating over the bad sores that eat into the vitals of our society; that they make a show of earnestness while their object is to hold all moral code to ridicule, and that they take brutal pleasure in describing what Carlyle calls "the open secrets of nature." An academic discussion on this tissue of charges is unprofitable, nay, uncalled for, because these neo-romantics have already secured a niche is our literature. We shall only touch upon one aspect of their intellectual output which they freely draw upon.

Most of these writers are tolerably educated, some of them are very distinguished *alumni* of our university. Some of them again, would have received signal honours from the state, if they were born in any other countries of the west. The spirit of neo-romanticism is a cult of the west; but it has slowly but surely permeated every stratum of our society with the advance of education and

spread of western ideas, along with the growing complexities of our life. This cult dates back to the days of Bankimchandra, the writer of "Bis-Briksha." The cue was taken up and followed by Rabindranath. But it took another turn in the hands of Sarat-chandra, Nareschandra, Achintya (an erstwhile student of this college and a contributor to this magazine), Buddhadeb and others. The vogue was created by a great master; but if there was anything conventional about the vogue, like that "luxury of melancholy" so dearly cherished by Lord Byron, the crude mask was justly thrown off and was replaced by frankness. Theirs is no 'half-conceal-and-half-reveal' method; really there is earnestness and sincerity in their literary adventures, though much of their work is yet nebulous in form and lacks literary finish. They look life full in the face and look it whole. Their style bears a distinctive mark of individuality. They are not 'idle singers of an empty day.' They study things first hand and not through the coloured spectacle of books. They have a catholic and democratic outlook. Some of them, appreciative students of literature as they are, have imbibed foreign ideas which they have harnessed into profitable use.

The neo-romantics have not been obsessed by visionary dreams, nor have they ever attempted to cure life of all its ills. The misunderstanding of the conservative school of critics arises obviously from lack of sympathy and unwillingness to appreciate the viewpoint of the opposing school, a great bane to scientific criticism. These obtuse-minded critics remain blind to the fact that our society has grown more complex than what it was a quarter of a century ago and that much water has flowed down the Thames since then. Many vital problems have come to the fore, "heavy as frost, deep almost as life." A classical poem like Ralph Hodgson's "Bull" has no appeal to them. Kuprin's "Yama the Pit" is a taboo, not to speak of the writings of D. H. Lawrence, James Joyce and Marcel Proust. And what of some of the most recent talkies? They glibly add, "Look at the starving millions, and look at the folly of the packed cinema-halls." But this tell-tale argument will butter no parsnips. People will be starved, and cinema-houses will be packed, unless some sumptuary laws are passed by the state.

The case of the neo-romantics may be briefly put up in this way: "Look here, we have studied life first hand, and we have seen these

things as they happen in our society. In our literary presentation we have made no hide and seek. The introspective study of character and the subtle psychology of its work, with its wonderful criss-cross of emotions have charmed us, but have not carried us off our feet. We have given you more than what you could have ever expected to find out for yourselves. But we do not want your thanks, we want appreciation and nothing else."

One of the amazing novels, published only recently, is **INDRANI** by Achintyakumar. A conservative father, by a sheer combination of circumstances, rears up his daughter Indrani and gives her university education. The girl becomes a graduate, falls in love with a young Baidya M.A., though she belongs to a high caste Brahmin family. But love, like law, is no respector of castes. The girl is rejected by her parents, marries her chosen groom, comes to live under his paternal roof, and unable to bear any longer the filthy abuse and humiliation of her sisters-in-law, accepts the post of a teacher elsewhere. There she is followed by her scholarly but do-nothing husband, who like a dotard, falls back upon his wife's resources. In this new sphere of action the girl interests herself in so many things that the husband is cast into the shade. Teased out of his wits, the husband leaves his wife's protection—the cart is put before the horse in the present instance—as his sense of self-respect has reached the breaking point. For a time the girl gleefully snaps her finger at this foolish betrayal by her husband, but the woman in her could not brook this for long. She resigns her post and comes back within the warm fold of her husband's protection. Such is in a nutshell the bare outline of the story. The writer has ruthlessly exposed some of the cankerous sores of our society,—its hidebound views, its crude notions about the object of female education, the drawbacks in the joint family system, the neurotic condition in which our 'educated' girls live, move and have their being, the sufferings which we foolishly drag upon ourselves in our conjugal life, and above all, our defective moral perspective. Without launching upon violent diatribes, the writer has cleverly woven into the fabric of his story rich dialogues in which we find many a refreshing answer to some of the ticklish problems of the day.

In some of the lyrics by another young Bengali writer, we have many jewels of thought and expression. They have derived their wonderful sheen and complexion not only from classical writers

in Sanskrit but also from classical and modern poets of Europe. The tinge of melancholy that passes like a golden woof through these lyrics has nothing morbid about it; it is what the Greek poetess Sappho calls "glukopikros"—the "bitter-sweet" of love, which pleases and yet creates disquiet. There is of course a note of revolt; but it is no idle threat of the man ousted from the happy Garden of Eden; it is a declaration of war against destiny. "Man is an infant crying in the night"—that is not the mood of the poet. On the contrary, he gives battle royal to unseen fate and goes so far as to rise against whole creation, to deflect the earth from its orbit. Some of the expressions used in Bengali sound quixotic; but the writer has undeniable boldness in breaking himself away from the safe moorings of the Rabindra-ridden age. This is no mean achievement on the part of the young writer.

The literary style of the Bengali neo-romantics is not confused jargon, as it is often brought out to be. On the other hand, it has a subtle dry perfume like that of the best brand of essence, elusive and fine. A literary Pundit may not find any grammar in it, but it will please all intellectual pabulum, however fastidious it may be. It is shot through with many reminiscences and allusions, and it has an intellectual dignity all its own. This style is specially suitable to an expression of introspective feelings and emotions which cannot be vented in any other garb. There is "an everlasting wash of air" and Shakespearean graciousness about it. The style itself, if not anything else, bespeaks much in favour of the intellectual neo-romantics, who under better auspices, bid fair to achieve greater celebrity than they have so far done. We are passing through a period of transition, full of intense stress and strain; but the day is not far off when the very best of literary productions will emerge out of this great welter of experimentation, like Venus Anadyomene coming out of the sea in her youthful bloom and pristine beauty.

The Cogitations of an Aged Man

Miss Bani Roy (2nd. Year Arts.)

I cannot forgive the sky of autumn if it is overcast with clouds. It has no business to be an abode of wandering vagabonds. Why, we had enough of those clouds in the sad rainy season! The clouds are really impertinent. Throughout the whole rainy season they played their royal game like absolute monarchs. I think, the stars, the moon and other planets of the Sky-kingdom have no idea of politics and they cannot realise what is meant by other people's being absolute.

Anyhow the clouds of autumn are queer fellows—

"They slip, they slide,
They gleam, they glance—"

always with a naughty demeanour. The flowers do not want them just now. Poor darlings! they have sufficient moisture and they are afraid lest another fresh shower should wash off their sweet odour.

The moon looks down roguishly. It is far advanced in autumn, yet why should she be kept behind the cloudy curtain ? She wishes to be modern. The Eastern Purdah-system does not suit her.

Neither can I forgive, too, a garden which does not yield flowers in spring-time and the most unfortunate part of it is that my own tiny garden fails to produce any flowers in that season. Spring sets in with its vernal breeze and smiling atmosphere, at least the poet says so. There is no use of pretending that you are not accustomed to notice this important fact, because if you happen just to open a monthly magazine in some restless spring evening, you are sure to alight at once on at least a dozen odes written to celebrate the advent of the flowery season. But alas! there is generally no trace of spring in the garden-croft of an aged man. The few scanty trees that still straggle beside the dirty walls sullenly refuse to bring forth blossoms. Only a few shy and demure bunches peep in awkwardly and at once feel out of place. I feel greatly inclined to follow the wake of Tennyson, muttering inwardly.—

"Nature's ancient power is lost"—

I cannot forgive those who call me aged. Nobody seems to understand that to call an old man 'old' is to insult him. It does not sound very sweet when people come and say in a casual tone, "Oh, you are rather old now; your hair is all white" etc. and mention my age with seeming surprise and reverence, thinking all the time—why does not the person die even now? It is high time for him to do so. Well, I understand them. My nephews and nieces declare often with a tinge of envy in their voices, "Why, uncle, you are getting young day by day!" Anyhow they want to please me. But it is devilishly hard to hear that you are old and the accidental bloom of youth is not due to you.

After all I do not feel old. I cannot say with Turgenev, "I look forward to a dark grave and not to a rosy future." I do not want to be a hypocrite, I will say what I mean. I am afraid of nobody. Some of the young dogs are apt to say that I have no sense of decorum. I do not believe them. What does one know of decorum unless he is nearing seventy? In that ripe age, when one sits with a 'Hookah' in an easy-chair, sometimes counting the beads (if he has a religious tendency, which, thank God! I do not possess) he becomes unnecessarily wise. He understands people as well as he understands his own self.

What I want just now is to settle down, in plain language, to marry. They say I ought to marry an old maid, but why should I do that when I am so young? You need not smile, I meant mentally, of course. Like Mr. Tanner in Bernard Shaw's'Man and Superman' I am enchanted with life-force. But oh woman? Thy name is treachery? The young girls will look at me complacently, receive my presents eagerly, smile and talk freely in my presence but the foolish beings will always choose a worthless young devil-may-care fellow at the time of marriage!

I have an interesting anecdote to tell you. Once I had the honour of falling in love with a young girl of striking beauty. She used to come every afternoon to goosip with me. Gradually I became crazy with love. I assure you that was no fleeting passion, that was love, pure and sublime as it is. I began to see her in the smoke of my 'Hookah', in the drinking water of my glass at dinner times and where not?

"I 'saw' her in the dewy flowers
I 'saw' her sweet and fair,

I 'heard' her in the tunefu' birds,
I 'heard' her charm the air."

Some days passed—perfectly harmonious and indulgent, I began speaking about her good qualities before my nephews and nieces just to prepare them about what should follow.

One evening she came as usual, but along with my eldest nephew, both looking very happy. In a jiffy I understood. They touched my feet and my nephew said, "Oh uncle, bless us. I thought you will be glad to get Renu as your niece as you always approve of her".

I cannot tolerate the song of 'papeea'. It stir my heart and fills the whole cheerless cavity with a new desire, a craving, an incessant longing. I want to be young again.

The earth is just as she was before, she has not lost even one atom of her divine beauty. The heart of mine is just as it was before, still it throbs with love and life. There is no love for me, no life for me.

Do not talk of devoting my remaining days in some work and attaining glory.

"What are garlands and crowns to the brow that is wrinkled;
'Tis but as a deadflower with May-dew besprinkled;
Then away with all such from the head
That is hoary—
What care I for the wreaths
That can only give glory?"

The Birth of Dramatic Literature.

Jyotirmoy Ganguly. (Third Year Arts.)

IF you are told that the barbarous dances performed by our semi-uncivilised ancestors in honour of the gods and goddesses, were in a way the progenitor of our modern drama, you will most probably doubt the speaker's intellectual development. Indeed it sounds more fantastic than Darwin's 'Theory of Evolution;' but, nevertheless it is there. If you study the history of the development of dramatic literature of any country, you will find the same story everywhere retold, that the origin lay in the dramatic portion of the divine service. The origin of dramatic art is religious. "In the garden-land of religion, the source of dramatic art wells up, dividing into many streams which widen as they run along, and traverse the provinces of life. Many new affluents, flowing from other springs, fall into the main stream and swell its current."

In Greece the drama took its birth from the festivals held in honour of Dionysus, the incarnation of generic power, and the god of agriculture, and the scenic representations which accompanied them. They aimed at religious instruction, refinement of morals and the education of the people, and there lay the germ of the Sophoclean and the Aeschylian tragedies.

The *Nataka* of India is nothing but a metamorphosis of *Nata* meaning dance. Later this *Nata* took the form of *jatra*, when also we see the religious element predominant. The themes of these *jatra* plays were incidents from the lives of Krishna, Sree-Ramchandra and other incarnations.

The Roman stage, though a direct offspring of the Greek parents, lacked the refined taste of the Greeks and the Indians; it had more of an athletic and gladiatorial interest than dramatic and tragic. As is usual with a nation which has fallen from a great altitude, the Romans were very fond of gross and vulgar amusements, and thus dramatic show which had once seen better and nobler days, had to make room for buffoonery and erotic dances. But Emperor Constantine put an end to these vulgar representations by issuing a decree against them.

But though the outward show of the sensual paganism received a death-blow by this, the church soon found out that unless

she could somehow gratify 'the love of gorgeous spectacular shows of the Roman audience', the hope of christianizing them is far remote. The simple church services were not sufficient enough to attract the audience who used to laugh at the scene of a wild beast tearing asunder the body of a poor unarmed prisoner. If the church wanted to hold her interest intact and to win over heathenism, 'she had to offer to the new converts a religious service and a liturgy that would appeal to them.' On the other hand, the difficulty was, that the early Christians were dead against all buffoonery and scenic performances.

However, the Church thought it better to make some concessions than lose its influence over the people, and decided upon adopting symbolical forms in her manner of worship. Christian or not, the populace remains the same and must be amused; the invention of scriptural plays would keep alive their religions faith, and sacred dramas would be a happy substitute for those of which they were denied evermore to be spectators, "And thus the altars that had been once built for the men-gods of paganism were now erected in honour of the God-man of Christianity. Like Dionysus in the pagan world, the Saviour became the central figure of the Christian liturgical dramas, Passion Plays and Mysteries from which the modern drama was developed. It is an irony of history that the Church which slew the old drama, gave birth to and reared up the new."

Scriptural dramas composed by the ecclesiastics, furnished the nations of Europe with the only drama they possessed during many centuries. Of these, the six comedies by Hroswitha, a Benedictine nun living in the tenth century, and the "Passion of Christ" written by Gregory Naziauzen in the fourteenth century may be nentioned as the earliest dramatic product. They were mostly experimential works, to win over the Christians of Constantinople from the dramas of heathen Greece and Rome, and their influence on the later secular plays is negligible.

Monks were the writers or inventors and a General communication was kept up with Rome throughout every Christian realm. This fact may account for the cause of the decentralisation of drama, if I may use that expression from Italy to France, the Netherlands and England. But the question may be asked that if the plays were all written in Latin how could the ignorant mass find any amusement form them? Or, if they were performed within the walls of the monasteries, how could they have been designed for the people?

In fact, the people worked out their own wants; taught learned clerks the only way by which they were to be amused by having

the same thing after their own fashion and comprehended in their own language, and thus the French, the Flemish and the English people had the classical dramas translated in their own dialects.

The audience now increased by leaps and bounds and soon the Church had to encounter another difficulty, that of accomodating this immense crowd This obstacle she could not remove from her path. The play walked out to the churchyard, thence to the neighbouring meadows and at last to the streets and market places.

For the secularisation of drama, another fact counted much. The sight of the priestly characters in their bizarre and grotesque disguises was reprobated by many; if they were condemned by one Pope they were condemned by another. The ecclesiastics, except on some rare occasions when exhibiting before royalty or nobility, were at length not reluctant to yield their place to a new race of performers. In the metropolis they never lost their control over these performances, for they consigned them to the care of their inferior brethren, the parish clerks; but in provincial towns it was not long before the people themselves discovered that they, with some little assistance from the neighbouring monasteries, were competent to take them into their own hands. "The honest members of guilds or corporations, of mechanics and tradesmen, formed themselves into brotherhoods of actors, ambitious of displaying their mimic faculty to their townsfolk." And thus the play slipped out from the fingers of the Church and wedded the laity.

In England, dramatic representation was not introduced before she came under the Norman rule. William the Conqueror brought with him an army of French monks over England, and driving away the English clergymen substituted them in their places. It was only then that dramatic show came into vogue.

The feudal barons of the early mediaeval age in England helped a great way towards the development of dramatic art. Without royal patronage art connot live, and the nobility in the feudal age was actually the royalty. "The church wished to instruct others, and the nobility to amuse himself and beguile his time." Thus on the one hand, the patronage of the Church and on the other, that of the barons reared up the dramatic literature of England in its infancy.

[The writer is immensely indebted to many authorities amongst which the name of Dr. Rappoport may be mentioned.]

Reserve Bank of India

Gobinda Roy (3rd year B.A.)

THE establishment of a Reserve Bank in India is now a settled fact and the Bill for the same is now in the Legislative anvil. But the idea of establishment of the Reserve Bank for India dates back to 1927 when Sir Basil Blacket, the then finance Minister of the Government of India tried to enact a Bill to that effect. But fortunately or unfortunately it could not be owing to the stern opposition led by Late Pandit Matilal Nehru of revered memory on the floor of the Legislative Assembly. Then the Central Banking Enquiry Committee recommended its early establishment and the White Paper proposed that responsibility at the centre for finances can only be inaugurated if a newly established Reserve Bank operates successfully. Hence the question of defining the functions and scope of a Reserve Bank was settled by two Committees, one in England and the other in India, as the result of their deliberations. Now the members of the Legislative Assembly are busy to mend or end some of the provisions of the Bill. Without going into the details of the merits and demerits of the Bill we do propose here to confine our discussions to the principles underlying a Reserve Bank,

The Indian Reserve Bank is nothing but a Central Bank of the like type in the continent. Though the idea of the Central Bank is not new but the real functions of the Central Banks of the continent have greatly changed after the Great War. Central Banks were practically existing in some countries as far back as 1656. We give below the dates of establishment of some of them ;—

Bank of Sweden	...	1656
Bank of England	...	1694
Bank of France	...	1800
Bank of Finland	...	1809
Netherlands Bank	...	1814.

The new attitude in both banking doctrine and banking practice which has developed just after the war can be attributed to the financial embarrassments of different Governments. During the War currency of every country was much inflated and it was found necessary when the necessities of the War ended to reorganise the

currency of every country. Several years after the war the Genoa Conference in 1922 recommended the establishment of Central Bank by each of the newly created States of Europe and also recommended a very close relationship between the Bank and the Government. Though almost all Pre-War-Central Banks were in some way affiliated to the Government they acted as fiscal agents of the Government and exerted a headship over the money market undertaking to regulate the flow of specie into and out of the country, and endeavoured more or less to control local rates of interest and discount. The advice of the Genoa conference was almost followed by many states and that can be seen by the following years of establishment of some Central Banks.

State Bank of Russia	...	1922
Bank of Lativia	...	1922
Bank of Lithuania	...	1922
Bank of Poland	...	1924
National Bank of Hungary	...	1924
Bank of Esthonia	...	1927

Now India in the year 1933 is going to have a Reserve Bank *The main functions of the Reserve Bank are :—

1) The note issue and the regulation of Credit.
2) The management of the rate of Foreign exchange.
3) To keep the reserve in accordance with the prescriptions of law.
4) To act as Bankers of the Government.
5) To be Bankers' Bank.
6) To satisfy indirectly the legitimate credit requirements of industry, trade and agriculture of the country.

The scope of the Reserve Bank is thus :—

---

*Banking business in India, as constituted at present, may be divided thus :—

1) Imperial Bank.
2) Foreign Exchange Banks.
3) Indigenous Joint Stock Banks.
4) Co-operative Banks.
5) Indian Bankers e. g. Sowcars, Multanis, Shahas, and Chettyars.

With the setting up of Reserve Bank, the banking group will be divided as follows in order of merit :—

1) Reserve Bank.
2) Imperial Bank of India.
3) Foreign exchange Banks.
4) Indigenous Joint Stock Banks.
5) Co-operative Banks, and
6) Indian Bankers.

1) It will be entitled to receive deposits without the obligation of paying interest to the depositors.
2) The sale and purchase of sterling and sterling bills of exchange, the minimum amount so transacted shall not be less than the equivalent of one lac of Rupees for such exchange business will not be transacted with ordinary clients.
3) Loans and Advances on
   a) Trust securities
   b) Gold
   c) Such internal bills of exchange and promissory notes as are eligible for purchase or re-discount by the Bank
   d) Sterling bills of exchange and treasury bills of sterling standard countries; and finally
   e) Such promissory notes of Member banks or provincial Co-operative banks as represent cash credits granted by these banks and as are supported by documents evidencing the title of goods.

The management of Reserve Bank, to say the truth, is an art and not a science and now we have yet to see in what shape the bill comes out of the hands of the Legislatures and afterwards how it is managed. We should remember the disastrous result of South African Central Bank.

A Child

Rani Maitra, (2nd year Arts)

Dear, soft eyes, holy, happy, bright,
From heaven was sent a light
To shine in the world's dark night.
Sweet, radiant smile, heaven-born,
Hope to the weary, life to the wan,
Ush' ring the birth of a new morn!
Angelic face! God's own smile!
All love and joy—and no guile:
Earth lifted to heav'n for a while.
World of darkness, doubt and fear
Behold a light divine is near,
O happy child! God's reflex here.

Matthew Arnold

By K. N. Daniel Muthalaly (4th Year B.A. Class.)

MATTHEW Arnold was decidedly one of the greatest prose writers and critics of the nineteenth century. As a poet also he achieved considerable success. Imbued with the best traditions of classical learning, he applied to the literary and educational questions of his age, a mind at once rich and thoughtful. As a critic he advocated a high moral purpose for all forms of art, and insisted rather too dogmatically, on very well-balanced and clear-cut expression. In Arnold we have the critical and the creative faculties combined in one solitary individual as it had never happened before or since. Professor Saintsbury says that a poet who is a critic is a miracle. It was in the field of literary criticism that Arnold's genius found its happiest expression.

"Throughout his life he was consciously trying to set up a neo-classic ideal as opposed to Romanticism; and unconsciously he was endeavouring to express a very decided, though perhaps not entirely genial or masculine personal temperament." In other words Matthew Arnold is on one side a poet of "correctness," that is to say a scheme of literature, which picks and chooses, according to the standards, precedent, systems, rather than one which gives an abundant stream of original music and representation. As a prose writer he enjoyed an international reputation being well known both in Europe and America. Outstanding among his literary contributions was "The Essays in Criticism" published in 1865. As a matter of fact he came into prominence as a literary critic of first magnitude, by the publication of "Essays in Criticism." He was also eminently successful in composing short poems especially elegies. Some of his best pieces are exceptionally beautiful and charming while those that are not the best are strangely unworthy of him.

Amongst his earliest literary productions is included the magnificent sonnet on Shakespeare, which perhaps better deserves to be set as an epigraph and introduction to Shakespeare's own work than anything else in literature writen on him by any other poet with perhaps one or two striking exceptions.

One of Arnold's literary productions was 'Empedocles on Etna.'

In regard to this he showed a singular vacillation. 'Merope,' another work from the pen of the same author, though not the happiest, contains some lyrical pieces of exceptional literary charm. His 'Thyrsis' is a pastoral lament on the death of the poet Clough and it is classed by some authorities not far below 'Lycidas' and 'Adonais'. The 'Forsaken Merman' is the most original and charming as well as the most exquisitely passionate and musical of his poems. In 'Dover Beach' his peculiar religious attitude is revealed.

About his religious views, it must be said of him that he was a man of firm religious convictions. To those who are in sympathy with his own way of thinking, he must always possess an extraordinary attraction.

Now turning to his prose works mention must be made of 'Culture and Anarchy', 'God and the Bible', 'St. Paul and Protestantism', 'Essay in criticism' and a host of others. Of their contents this much is sufficient to say that apart from the popular audacity of their wit and the interesting spectacle of a pure man of letters confidently attacking thorny questions in religion and theology without any apparatus of special knowledge and study, they are replete with brilliant passages characterised by nobility of style with grace of expression.

Though he wrote considerable poetry he never attained wide popularity as a poet. The Greeks, Goethe, Wordsworth—these are the prime literary sources of Arnold's poetical inspiration. The Wordsworthian 'note' as the poet himself might say is clearly heard in 'Resignation', 'To a Gipsy Child' and 'Mycerinus'. Distinct echoes of 'Laodamia' are caught in Mycerinus while the grave movement of 'To a Gipsy child' is quite after Wordsworth's manner. But the Wordsworthian influence is most clearly discernible in 'Resignation'—at once a poem of nature and a cry from the depth of the poet's own soul. 'Sohrab and Rustum' is the most finished and successful of his narrative poems, treated here with a clearness and sustained elevation of style, unparalleled in modern English literature. The poem is thoroughly Homeric in manner and substance. One of the striking features of Arnold's literary productions was the wonderful clearness and lucidity of his style. His effort after perfection of form led Leslie Stephen to think that the 'quality of adhesiveness' was a striking feature of his poetry.

However his literary works bore the impress of his personality The charm of his personality was the very reason why he was eminently successful as an essayist. Some of his verses were

vigorous and dignified, showing that he had conceptions of noble impulse and character. The simplicity and sweetness of his diction is everywhere apparent and in particular in pieces like 'The Scholar Gipsy' and 'Sohrab and Rustum'. He had an admirable and powerful individuality of literary style which defied imitation.

His remarkable success in prose induced him to abandon poetry for prose. His prose writings deal practically with the entire fabric of English civilisation and culture in his day, and they are directed by one clear andconsitent critical purpose. As already mentioned his success as a literary critic was assured by the publication in 1865 of a volume entitled 'Essays in Criticism. This created a great sensation in literary circles. In fact the critical works which he published from time to time were the events of the literary world. By subsequent publications he rose to the highest pinnacle of glory. One of his most stimulating books entitled' Culture and Anarchy' continues to exert a strong influence over young minds.

One of the most admirable qualities of his prose style remains to be recorded. And that is nothing else than his genius for telling phrases and expressions as for instance when he speaks of religion 'as morality touched by emotion', and of 'the sweet reasonableness of Jesus—these and other expressions have got an epigrammatic quality. In conclusion, it must be said that Matthew Arnold has great claims to the memory and admiration of posterity not only because he possessed a versatile genius and a forensic turn of mind with the capacity for expressing itself in rich and abundant language, but because in addition to this he was a charming personality having the courage of his convictions, and so was able to influence powerfully modern religious thought in England.

"*The Gallant Scots.*—As a party of very pretty girls approached the camp of the Royal Scottish at Wimbledon, the band struck up—'The Camp-belles are Coming!'"—*Punch.*

The Next War

Kamalaksha Bhattacharjee (*Third year Arts*)

OUR minds are obsessed with one question—Is war coming? If at all, when and how that may happen and will India be benefited by it? After surveying the present politico-economic conditions, we can fairly come to this conclusion that war may come and at least it is necessary for various economic reasons, which will take thoroughly different shapes and will change this phase of worldslum and of depression. Malthusians say that some natural or artificial means are necessary to do away with the surplus population of the world and the war is one of the means. Assuming that Malthus' theory is not held good, the war is rather necessary than unnecessary, rather a blessing than a curse in so far as it arouses the long sleeping passive motives into an active motive, which will be soon translated into manly action—*viz.* war.

The Germans have been defeated and humiliated and they have been forced to concede to the terms of the Treaty of Versailles. Let a European politician tell how the Treaty was to Germany. He says—"It was the most crippling treaty ever prepared in modern times. Germany was an industrial nation depending for subsistence on her mineral resources and on her foreign trade. The treaty demanded that she should give up her coal and iron; Alsace-Lorraine and Sarr Coalfields to France and the upper Silesian area to Poland. And it systematically ruined her trade, her mercantile marine was to be confiscated (with an exception of some of her ships under a thousand tons). She was to be deprived of her colonies and even those great internal arteries, rivers, were to be put under international administration. In addition to the loss of so much territory, to the payment of an unspecified indemnity, to the loss of most of her minerals and her trade, Germany was to be saddled with the sole guilt of the war: Article 231 of the Treaty." A great nation like Germany fell down, never to rise again within ten years but very recently Hitlerism has risen to power—an issue of the Treaty of Versailles.

Hitlerism is the most opportune movement Germany has ever seen since the days of Bismark. It has been launched with the

idea to resuscitate the great German nation once again and make good their prestige lost before the world's eyes. So Hitler has repudiated the war guilt and has demanded equality in armaments for self-defence. They want to live and live honourably.

France is the most dreaded and powerful enemy of Germany and she is always on the look out that Germany may not rise again and create havoc as they did once in the Great War. No nation is more interested in German affairs than France is. France, directly and indirectly, is encouraging to increase armaments and to invent new gas.

The people well understand what injustice they have done to the Germans and the German people will take reprisal when the opportunity arrives and so the preparation is afoot if Germany demands another war in future. Germany has been parcelled out and given to the surrounding weak nations; economically they have been deprived of the rights in their own country; colonial possessions have been robbed from them by the dictation of this French people. There is no wonder if Germany demands war with France and that war will be, in the words of Mr. H. G. Wells, far more swift and extensive in its destruction more particularly to the civilian population and there will be no distinction between combatants and non-combatants because every able-bodied citizen, male or female, is a potential producer of food and ammunition; and probably the safest and certainly the best supplied shelters in the universal cataclysm will be carefully buried, sandbagged and camouflaged.

So, war is inevitable in that quarter and it will turn one of the two sworn foes into an insignificant nation.

Italy is burning within herself because she joined the allied powers on condition that the Dalmatian Coast would be given but that was not given and so Italy is not satisfied. Deuce is there and he has a hawk's eye on the Mediterranean. The British cannot restrict the movement of Italy, knowing that it will hazard their Indian passage. Italy is implicated in the Five Power Pact and in other Pacts and she holds a very favourable position in the European politics. Every nation of Europe looks up to Italy with respect because she is next in importance to America, England and Japan. Other small nations such as, Hungary, Austria, Yugo-Slavia, have their own woeful tales to tell and the immediate present requires no elaboration on them.

The Life of the Nation

GENTLMEN & LADIES! Among you who are students of Literature or Linguistics, nothing can more emphasise the importance of the study of the Bible than the fact that it was the authorisised version that was compiled during the Elezabethan Age of the English Literature when Willam Shakespeare was about to bid farewell to his heroic activities. Those who are students of Philosophy or Theology know already what the Bible means to the modern civilised world, to those who are followers of Jesus Christ and even to those who are mere admirers of this great Son of Man. And keeping aside for the time being all other facts which may or may not appeal to your reason, I would also like to point out that if you were to try to understand a little deeply what the Bible has to give, it would not injure your religious susceptibility in any way but probably the understanding of one religion which seems very much different from yours but which is in fact more similar and allied to yours than any other will but help you to be firm in the one in which you profess to believe in.

To-day, I do not mean to start with the proposition that whntever is said in the Bible must be an infallible verity or that there is even a quantum of sanctity invariably attached to its orthography, syntax, punctuation,rhetoric and lexicography. I am a most innocent lay man. I mean to make only an humble endeavour to show the real character of the Bible which has inspired the whole of Europe and America the fact upon which its greatness stands, and what it has to give to a Nation believed to be in the throes of a Transfiguration.

What the Bible is:

Apart from its place as the scripture of a particular community and among the World Religions, with which I have taken the vow not to deal now, from its first book in the Old Treatment to the last page of the New, the Bible depicts the Life-History of a people who looked upon themselves rightly or wrongly as the "chosen ones" of Jehovah' Jove on Elohim, and puts before our eyes the gradual evolution of a primitive race of mankind under the leadership of

memorable Kings and Prophets, most of whom acted as intermediaries between the One God of Horeb and Sinai and the Israelities (from which perhaps the Theory of Divine Rights might have been later inspired and the conception of the Papacy keeping aside the important fable of St. Peter's Key of Heaven), and how this slow growth of a Nation among whom an intensive sense of Nationalism was palpable at every stage of its existence rapidly changed to a strong revolutionary current with the advent of Jesus Christ, the Crucified King of the Jews. Then came the diverse parties in opposition to the Messiah, the Scribes and Pharisees, and a close contest ensued in which the communal jealousies of the innumerable tribes and clans of Syria and Palestine became more prominent for a moment than at present appear in India. And though it will be a direct lie to say that Jesus Christ was personally responsible for the physical or historical foundation of his Church, I must not refrain from saying that it was due to the acts of this Great Man that a New Spiritual Constitution could be formed (we are not here concerned with the Ecclesiastical History, and theories and synods) in which there was no separate electorate and no reservation of seats for the protection of special interests and which in fact ushered in a greater Federation of States and Peoples than that designed in the modern White Paper.

A Continuous National Movement : From such a book we learn that the Sons of David moved from one place to another in search of the promised land—a "land flowing with milk and honey." They moved on and on, but they could make no permanent abode. In course of time they were scattered all over the world, but still we see them moving: They have life in them, and we can read in it a really continuous National Movement.

The other day, Dr. Gerecke of Germany is reported to have declared with some sort of cynical humour not unmixed with contempt: "Thus will our Ahasuerrs be compelled to take up his wanderer's staff again." Let him do. Let him have the life he loves. But in this we have a lesson to learn. If as a Nation we are determined to live and not to die or decay any day in future, as we almost died but yesterday and are still in the remaking, we must have physicians among us to feel the Nation-wide pulse every instant, and any National Movement which must be the surest criterion of National Life must go on for ever unceasingly in all times of War, Peace or Neutrality.

Next the problem is, who is to give the lead, what sort of a man is He?

It is said, "Blessed is He that cometh in the name of the Lord." It is such a man, not a self-confident atheist, plain, frank, and outspoken, not a hypocrite, but a man of indomitable Will-Power and undaunted courage, a man regardless of that amount of sacrifice he is to make, not lacking in a few scintillas of godliness that is to ride in the vanguard and hold aloft the winning banner. For these were some of the virtues discernible in Jesus to a great degree as also in some other Prophets and Leaders of Men. And such a stupendous moral force can never be wholly conquered. If not at once this day the morrow will bring such a man success and the voice of the opposition will invariably be silenced. Like Jesus going into the Synagogue of Jerusalem and throwing out the merchandise from the shops in the temple because it was not a fit place for barter and exchange, the leader who could alter the destiny of a Nation would "serve" with the authority of a Dictator and he would clear out from the path of the Nation whatever might obstruct its unhindered progress. He could do because he had the support of a Superhuman Force in whom he had unquestioning Faith and to whom he had surrendered as a child unto the bosom of its Father.

The Taste of Freedom and a Taste for Freedom: But even when such a leader or rather a Spiritual Giant approaches will there be many to follow him? Will there be a handful, half a dozen to march after him? Or will there be only men to test and yet to deny him like the Scribes and Pharisees? Nobody will do so if he has already a genuine taste of Freedom and for Freedom, that is to say, if owing to the foolish activities of his compeers the conception of Freedom is not a forbidden fruit to him.

When St. Paul was arrested, bound with thongs and scourged in Jerusalem and when the Chief Captain came to hear the rumour that he was a Roman, he said to save his skin: "With a great sum obtained I this Freedom". Immediately the reply came from St. Paul, "But I was Free Born." It was perhaps the same thing that Rousseau at the French Revolution asserted: "Man is born free (and he is everywhere in chains.") This is the birth-right, according to St. Paul, of every man and every woman, and it does not appear to be highly criminal or immoral for him or her to make the attempt to regain it if lost. And I must tell you at the top of my voice, Gentlemen and Ladies, if you want yourselves the Freedom for yourselves and the Nation, you must give to your children,

brothers and sisters and neighbours, the full privilege and enjoyment of it, you must rouse a taste in them for Freedom, you must create in the country an atmosphere for the true reception of Freedom. If you deny them, they will never apprehend the import or significance of Freedom—,as you do not, I must then assume, and it will be a term borrowed from the Dictionary, a catchword of unjustly vaunted oratory.

When there is to be any fight for Freedom, let each individual feel that he has the duty to contribute something towards it, otherwise his life will not be worth living. Let the most insignificant man or woman in the village corner unconcerned with the outside world think that the large-scale struggle for the National Freedom has in it also the smaller-scale struggle for the manumission of his or her individual soul, and let the child in the cradle, the dog in the manger, hunger and thirst after freedom. Otherwise the National Movement will never comprise the whole of India.

"I am not come to destroy the Law and the Prophets, but to fulfil."

Mere destruction or annihilation of anything tangible cannot be the sole aim or motto of a Nation. The justification of destruction must be found in the nobility of constructive achievements. If we look to the one side, because for the time being it seems to us most important and an emergent affair, it is doubtful whether success will ever come to our hands at all. If we but go on heaping up ruins after ruins, burning and pounding and delighting in making a mess of everything on the way of the Nation without at the same time raising a new structure instantly, the losses will never be repaired and the entire country will but stand as a testimony of endless and eternal destructive power. It is time also that we should remember that the Roman arms carried not only the sword but various tools and implements and even much more.

Sir Jagadish Chandra Bose.

By Nikhil Ranjan Banerjee, Ex-Student.

এই অসীম নির্বাক উদ্ভিদ্ জীবন প্রাণী জীবনেরই প্রতিধ্বনি। উভয়ের জীবন প্রথা একই নিয়মে পরিচালিত।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

La vita animale trova uneco nella vasta vita inarticolate delle plante. I processi vitali delluna dell altra sono guidati da leggi identiche.

J. C. Bose. *

OF the few persons who have solely dedicated their lives for the good of mankind and for the glory of God, Sir Jagadish Chandra Bose's name strikes us straightway. By his efforts towards despelling the darkness of ignorance from this holy land of peace and purity, he has raised India in the estimation of the world. For a long time, the Westerners had a fallacious notion that India is a sub-continent where queer-looking people live in a mysterious fashion practising their infernal arts. Many cock and bull stories, with which no reality corresponds, were told generation after generation by the grandmamas in Europe. It is Sir J. C. Bose, who for the first time, proved by his epoch-making discoveries that the master-minds of Hindustan have not lost their creative capacities;—and our motherland is still radiant with beauty and pulsating with life.

In the days long gone by, India had a refined civilisation which contributed much to the progress of Philosophy and Science. By repeated foreign aggressions her culture was jeopardised in the hands of the infidels and consequently came the DARK AGES, when Europe made rapid progress in different branches of knowledge. But with the coming of the English new thoughts have penetrated into our mind. And the intellectual renaissance comes afresh in India with Sir J. C. Bose as the standard bearer. Rightly

---

* These are the sum and substance of his latest discovery with a translation for his Italian students.

Prof. Cornu, the president of Paris Academy of Science wrote to him :—"You should try to revive the grand traditions of your race, which bore aloft the torch light of Science and Arts and was the leader of civilisation two thousand years ago". From what poet Rabindranath Tagore, Sir J. C. Bose, Lord S. P. Sinha and Sir C. V. Raman achieved, we may safely conclude that India still maintains her cultural supremacy in Asia, as did our ancestors over the eastern world two thousand years ago. Not even the Imperial Japan had drawn international reputation more than the slave India.

The early career of Jagadish Chandra is not worth mentioning save a few instances of his marked bent towards inventions. Graduating himself from the St. Xaviers' College, he was admitted in the London Medical College. But he gave up his medical studies before long and entered Christ Church College, Cambridge, from where he passed the B. A. examination in Physics, Chemistry and Botany with Natural Science Tripos. Next year he secured the Bsc. degree from the London University. His friend, Prof. Fawcelt. the celebrated economist, introduced him to Lord Kimberley, the then Secretay of State for India, who sent a letter to Lord Ripon, the Viceroy and Governor General of India, requesting him to provide Mr. J. C. Bose in the Imperial Educational Service. His Excellency referred the case to the Director of Public Instruction, Bengal, who appointed him as the Professor of Physics in the Presidency College, Calcutta. Who could have dreamt that this professor would cross the Channel again to preach his startling theories and attract students from abroad? Then there was no laboratory worth the name in the college yet he continued his research works through difficulty till he attained the desired end. In this way he succeeded in finding out "electromagnetic waves" which marked him as one of the brilliant experimentalists of modern times and which led to the development of the electromagnetic theory of light and its remarkable applications culminating in the inventions of wireless Radio Broadcasting of to-day. In 1895, he demonstrated his new theory in Calcutta in presence of the governor and many distinguished scientists that message can be transmitted without wire. He also explained it in the British Association and in the Friday Evening Discourse of the Royal Society. The University of London honoured him with a doctorate degree and in 1896 he was received by Lord Kelvin, the greatest scientist of the 19th. Century, Sir J. J. Thomposon and Mr. Oliver

Lodge. Of this event the Times remarks:—This gentleman (J. C. Bose) had, by his strikingly original researches won the attention of scientific world,— Lord Kelvin declared himself literally filled with admiration for so much success in these difficult and novel experimental problems. After this he delivered lectures at the *Societe-De-Physique* of Paris and at the Universities of Berlin and Kiel. This is indeed a desirable honour which was for the first time accorded to an Asiatic for scientific inventions. In the mean time news came that one Marconi, a professor of Bolgua University declared to have invented wireless telegraphy, who forthwith registered his new invention. He was not daunted at this. Sir John Woodburn, the Lieutenant Governor of Bengal, who saw in him immense possibilties lying in the womb of the future, always encourged him. Sir J. C. Bose further noticed that under electric shock and under poison animal and metal behave similarly, which led to the discovery that metal which is lifeless even to most keen observers has life. To this a famous British metal expert humourously remarked that he was very glad to learn that metal has life too !!! In 1901 he visited Europe and attended the International Congress of Science and also deliveeed Lectures in the American Association of Advancement of Learning, Baltimore.

In 1913 he was honoured by the Punjab University and in 1915 he again visited America. Invitations came from all the country. He had the unique honour to be invited to deliver lectures in the Academy of Science, New York, the Institute of Arts and Sciences. Brooklyn, the Universities of Harvard, Chicago and Columbia. In 1920 he was elected a Fellow of the Royal Society and Sir M. Sadler of Leeds University openly received him for his works.

Lately he has turned his attention towrds plant physiology. Everywhere his theory was opposed for super-speculation in his recent achievements. They argued that he has been swayed by intangible mysticism common to his country. But luckily his discovery has already received recognition from eminent scientists like Timiriazeff of Moscow, Preffer of Leipzig, Haberlandt of Berlin, Chodat of Genéva, Vines of Oxford, Molisch of Vienna and a host of others.

In 1928 he joined the sitting of the League of Nations at Geneva. Both the British Association and Geneva University presented him with addresses. Afterwards he was honoured by their majesties the King and the Queen of the Belgians with

other nobilities in a specially arranged court. He was also created *"Order De Leopold"* of the Belgian Government, when Prof. Einstien said:—We should erect monuments separately for each achievement of Sir Jagadish Chandra Bose. Mr. Beraard Shaw gratuitously remarked of him in this pithy sentence:—From the least to the greatest biologist. Mr. Romain Rolland addressed him as the revealer of a new world. The Nanking National Research Institute paid him a glowing tribute with this cablegram:—Many happy returns to the life dedicated to discovering ultimate truth and mystery of life......All Asia shares in your glory. Poet Rabindranath Tagore also wrote of him:—

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি হে আর্য আচার্য!

The glorious achievements of Acharyya Jagadish Chandra Bose are the everlasting monuments of his greatness. Let us pay our homage to him in the language of Romain Rolland "O handsome magican, to thee I bow."

Odds and Ends

(Prof. Bibhutibhushan Ghoshal)

THE REAL DOROTHY WORDSWORTH:

MR. ERNEST DE SELINCOURT'S book, "Dorothy Wordsworth: A Biography (Oxford)" shows Dorothy to have been an original character, brimming with good spirits, and impetuous in her enthusiasm for life. She flouted the conventions which so rigidly hedged in a girl during the nineteenth century. She risked scandal by setting up a *menage deux* with her poet-brother, and leading with him a Bohemian and eccentric life. She refused to attend church. She talked and argued with men; she stayed up all night discussing poetry and philosophy with Coleridge (sitting at his bedside and cooking him mutton-chops at midnight). She accompanied her brother on walking tours in unlady-like garments. She slept with him in straw-lofts, and sat with him on mountain tops while he slept in her arms. An entry in her famous Journal reads: "I went and sate with W. ..He read me his poem. After dinner we made a pillow of my shoulder. I read to him and my Beloved (Wordsworth) slept." When Wordsworth had occasion to leave her for a night, "to ease her loneliness she sleeps in Willam's bed." And during his absence she resolves: "I *will* be busy. I *will* look well, and be well, when he comes back to me. O the darling! Here is one of his bitten apples. I can hardly find in my heart to throw it into the fire." All these quotations testify to superb marriage of two minds, such as is rare between husband and wife. Mr. Selincourt observes that "this passionate devotion of brother and sister is among the most profoundly moving things in literary history."

A CRIME THAT MADE LITERATURE.

On an autumn night in 1823, John Thurtell, a wellknown gamester and man about town, murdered his fellow-sportsman, William Weare, a solicitor, in a lonely lane at Radlett, near Elstree. The plea taken by Thurtell was that Weare had cheated him of £300 by false cards. The circumstances of the crime struck the public ima-

gination. Lord Lytton based the murder of Sir John Tyrrell in "Pelham" on Thurtell's crime. George Borrow brought him into "Lavengro." Carlyle got his famous jibe about gigs and "gigmanity" from the reply of a witness in the trial who testified to the "respectability" of a person by mentioning the fact that he kept a gig. At least two plays were founded on the story. John Mitford wrote a weird and powerful poem under the title "The Owl". In a letter to a friend Charles Lamb remarked that at the moment he was writing he supposed that Thurtell was coming out on the "New Drop" (scaffold) at Bedford Jail.

LITERARY ANNIVERSARIES OF 1934.

On July 23rd 1834 Coleridge who possessed "the art of making the unintelligible appear intelligible" passed away; and on December 29th the "gentle-hearted Charles" Lamb followed him to the other world.

The great Victorians were beginning their work in 1834. Tennyson was producing some of his exquisite lyrics. Dickens was enjoying for the first time the pleasures of print. Thackeray was striving to keep the *National Standard* alive. Trollope joined the post office as a petty clerk. Macaulay had gone to India; Browning was in Italy—with only his immature firstfruits behind him; and George Borrow was in St. Petersburg. In that year De Quincey began contributing to *Tait's Magazine* and Edgar Allan Poe to the *Saturday Visitor*. It was in 1834 that the forty years' correspondence of Carlyle and Emerson began, and "*Leigh Hunt's Journal*" was started.

Among other writers, besides Lamb and Coleridge, who died in 1834, were William Blackwood, founder of Blackwood Magazine; Malthus, the famous writer of the "Essay on Population"; Chalmers, noted for his "Biographical Dictionary"; Edward Irving, founder of the sect known as the "Irvingites"; Joseph Drury, head master of Harrow, who taught Byron; Robert Morrison, who translated the Bible in Chinese.

The literary celebrities born in 1834 included William Morris, a poet, socialist and craftsman; C.H.Spurgeon, who has left inspiring sermons; Baring-Gould, author of about a hundred works on variety of subjects; Du Maurier, writer of *Trilby*; Sir John Lubbock (Lord Avebury), scientific author and reformer; Sir John Seeley, author of "*Ecce Homo*"; Lord Acton, who planned the "Cambridge Modern History"; Henry James Byron, dramatist, and

first editor of *Fun*; Roden Noel, poet and critic; and Augustus Hare, author of many works on travel and topography.

The literary output of 1834 was amazing. A brief list of some of the leading works of the year is a sufficient proof of this remark. These were: Isaac Disraelie's *Curiosities of Literature* (completed);his great son's *Revolutionary Epick*; Lytton's *Last Days of Pompeii*; Hemans's *Hymn for Childhood*; Marrayat's *Midshipman Easy*; Landor's *Shakespeare*; Martineau's *Taxation*; Sir Henry Taylor's *Philip von Artevelede*; Wellington's *Despatches*; Newman's *Lyra Apostolica*; Maria Edgeworth's last novel, *Helen*; Hogg's *Life of Scott*; Gogol's *Stories of Little Russia*; Victor Hugo's *Claude Guex*; Crabbe's *Works* (edited by his son); and John Galt's *Literary Life* (for which William 1V awarded him £200).

SAYINGS OF GREAT MEN:

Some sayings of the great politicians of the present century are culled at random.

Lloyd George: The labour man in office is a failure. He does not understand business.

The pinch of respectable poverty was hard to bear.

The league of Nations might fail, but it will be an historic fact.

The strong silent man is a myth. All the big business men I have known have been great talkers.

Briand: What is the good of news if it is not interesting?

J. H Thomas: Responsibility has an extraordinary effect. Take my tip! If you want to calm a man down, put him in the Cabinet.

Curzon: I have always been misunderstood. It has been assumed that I am a pompous man. I hate ceremonial.

THE WORLD'S LONGEST NOVEL:

Messrs. Methuen are publishing a novel entitled "All Men are Brothers." It is claimed to be the longest and oldest novel in the world. It is a translation from a thirteenth-century Chinese novel by Mrs. Pearl Buck. She took four years translating it; and she collaborated all the time with a Chinese scholar. The book was banned in China in 1799 by the Imperial mandate.

THE FIRST RECEPTION OF ROBERT BROWNING:

It is interesting to note that when Browning's early book of poems, "Bells and Pomegranates" appeared, John Stuart Mill offered to review it for him in an important magazine. Browning was very much pleased; but he was surprised to learn that this could not be done, as the book had already been reviewed in their pages. He hunted up all the back numbers diligently, and at last, discovered in "The Editor's Table", the following mention of his poems:—

"Bells and Pomegranates"
by
R. Browning.
Balderdash.

ROSSETTI'S HOBBY:

Dante Gabriel Rossetti used to keep all kinds of animals in the garden of his house. Once he was going to buy a young elephant for a huge sum. Browning said to him, "What on earth will you do with him, Gabriel?" Rossetti replied," I mean to teach him to clean the windows; then when some one passes by the house, he will see the elephant cleaning the windows, and will say, 'Oh, that's a painter called Rossetti, and he will say, 'I should like to buy one of that man's pictures'. So he will ring and come in; and I shall sell him a picture." Artistic idea—is it not?

MR. HUGH WALPOLE ON THE NOVELS OF 1933:

"For myself, "writes Mr. Hugh Walpole," I am constantly told that I am traditional, romantic and so on. I am not in the least ashamed of being traditional so long as I am also of my time. I have watched the English novel now for ten years, struggling, in advanced circles, to rid itself of the two necessities of the novel, Character and Narrative, and I am happy to say that it has failed to do this in 1933 even more than in 1932 and 1931. I cannot think of a single English novel in 1933 of the autobiographical-aimless-characterless, Joycian school that has scored a success even with its own adherents. The critics themselves who support this non-character type of so-called novels are beginning to feel the creative air about them desolate and empty. On the other hand, it is absurd to limit the novel, ignorant and arrogant to pretend that Joyce, Virginia Woolf and Lawernce have taught the English novel nothing. And incidentally, what living and memorable characters there are in Mrs. Woolf's novels—Mrs. Fleming, Mrs. Dalloway, Jacob, his mother, the heroine of 'A Voyage Out'. I

cannot see that our older novelists this year have learnt anything, however, from these newer techniques and psychologies. It has been a very thin year for the older-established novelists. ..The *average* is high; the room at the top is sparsely filled as ever,..... This has not been, frankly, a year of great successes in fiction. Where are the young novelists who will show true originality and courage in the novel?"

He mentions, however, the following six novels, that seem to him likely to survive the present season: I. "A Glastonbury Romance" by John Cowper Powys. 2. "The Unforgotten Prisoner" by R. C. Hutchinson. 3. "So Wall" by L. A. G. Strong. 4. "Peter Abelard" by Heden Waddell. 5. "Stallion" by Marguerite Steen. 6. "Pocahontas" by David Garnett.

TEN LINES OF MACBETH:

The following letter appears in the correspondence columns of the New York *Saturday Review of Literature*.

Is Shakespeare dead?

Sir:"Is Shakespeare dead?" asked Mark Twain. Echo and I answer:"Is he?" for on P.80 of Logan Pearsall Smith's "On Reading Shakespeare" I got a start. Smith quotes ten lines of *Macbeth*, and in them are the titles of nine modern books,even to a detective story. Precisely (or, nearly——I cut off a "This" from the Watkins title, and a plural from the Huxley) substituting the author's name in place of the Shakespearean words of his title, the passage reads:—

STEPHEN MCKENNA, and tomorrow,
Creeps in this petty pace, FERDYNANAD GOETEL,
To the last syllable of recorded time;
And H.M. TOMLINSON has lighted fools
The way to CLIFTON ROBBINS. Out, out, ALDOUS HUXLEY!
Life's but an ALFRED NOYES, a SHIRLEY WATKINS
That struts and frets his ANN PINCHOT,
And then is heard no more; it is a tale
ROSE MACAULAY, full of WILLIAM FAULKNER,
Signifying nothing.
It almost makes sense even that way.

Philadelphia, Pa. H. G. Castor.

DICKENS'S FIRST APPEARANCE:

The first story of Dickens appeared in December, 1833,

in "The Monthly Magazine of Politics, Literature, and the Belles Lettres" No. 96. The story was entitled "A Dinner at Poplar Walk". Dickens writes that it "was dropped stealthily one evening at twilight with fear and trembling, into a dark letter box, in a dark office up a dark court, in Fleet Street". On the occasion of its appearing in all the glory of print he says, "I walked down to Westminister Hall, and turned into it for half an hour, because my eyes were so dimmed with joy and pride, that they could not bear the street, and were not fit to be seen there. "The story reappeared in revised form in "Sketches by Bozz" under the title of "Mr. Minns and his Cousin".

WHO WAS SHAKESPEARE?

Who wrote the plays attributed to Shekespeare? Some say it was Bacon; there are others who assert that it was Edward de Vere, seventeenth Earl of Oxford, though he was Shakespeare's senior by fourteen years, and he died twelve years before the death of Shakespeare. Rear Admiral H. H. Holland in his "Shakespeare, Oxford and Elizabethan Times" gives an ingenious theory. Oxford wrote a good many plays, and then adopted "Will (not William) Shake-speare" as a pseudonym. A young actor from Stratford named William Shakespere was struck by the coincidence of the names; and he decided to write plays himself. He wrote most of the chronicle plays and also many plays (a few of which are included in the Third Folio) that are not nsually attributed to him. The Admiral presents his theory with conviction; and he laboriously hunts up topical allusions in support of his blessed theory.

THE HUSBAND OF GEORGE ELIOT:

After the death of Lewes, George Eliot married John Cross, an old friend. She died only a few months after the marriage. Some years after her death, at a luncheon party, the conversation turned on George Eliot. Dame Madge Kendal remarked that she had married only for one reason. A tall thin man, at the other end of the table asked her the reason. "To have the word 'Wife' on her tombstone", replied Dame Madge. A strange look came into the eyes of the interrogator. He simply said, "I was her husband". Just imagine how Dame Madge felt!

DO YOU KNOW:

In 1922 converts in an Australian prison went on strike because the cloak-and-sword romances written by Mr. Robert W. Chambers, the American author, were taken off the library list?

Mr. Maurice Hindus, the American writer on Russian affairs, wrote one of his books in the bathroom of a Berlin hotel?

In Calcutta, in September, 1839, just after midnight, a smart shower of rain left behind it a large number of fish, distributed in a straight line for a distance of fifty yards?

The Natives of Sarawak live in what are called Long Houses, capable of holding anything up to 1,000 persons, one being noted as over half a mile long?

PROPHETIC NUMBER:

The following table published in an English periodical may interest our readers.

The year	1880	Date of commencement of first Boer War
War lasted	1	year.
	1881	
	1	
	8	
	8	
	1	
	1899	Date of commencement of second Boer War
War lasted	3	years.
	1902	
	1	
	9	
	0	
	2	
	1914	Date of commencement of Great War
War lasted	4	years.
	1918	
	1	
	9	
	1	
	8	
	1937.....	*What then?*

From the General Secretary's Desk

Sukesh Banerjee
General Secretary.

OUR old friends of the Executive Committee of the Asutosh College Students' Union relegated their respective powers to our hands on the 18th September, 1933. Our term will continue till another election in September next.

* * *

The day on which we parted from our college friends for the Durga Pujah festival was indeed a memorable day. There was a social gathering in our college and we had the fortune of having Mr. Santosh Kumar Basu, the Mayor of Calcutta Corporation amidst us. Many distinguished gentlemen and ladies of South Calcutta were invited to attend our function. Suffice it to say, our function was a success.

* * *

The first meeting of the Executive Committee took place with Mr. Anil Kumar Basu, co-opted member, as President. The house expressed inexpressible sorrow at the death of one of the greatest sons of India, V. J. Patel.

* * *

Our ever-popular and venerable Professor Amal Kumar Roy Chowdhury M.A., B.L., has been re-elected President of the Students' Union. We are indeed fortunate in having him again with us for the session.

* * *

The vacant posts of the Foot ball captain and the secretary-in-charge of the Poor Fund were kindly filled up by Nakuleswar Das Gupta and Durga Prosad Mukherjee respectively. Basanta Sen Gupta, Anil Kumar Basu and Anil Roy were also elected co-opted members of the Executive Committee of the Students, Union.

* * *

A meagre contribution of rupees thirty was sent to the Flood Relief Committee of Midnapore. I am sorry to say in this con-

nection that out of rupees thirty, rupees twenty five and annas fourteen were collected from our sisters. However on behalf of the Students' Union, I thank them cordially for the motherly conduct they had shown in the cause of the flood-stricken distressed people of Midnapore.

* * *

A sub-committee with Dhirendra Nath Biswas, Anil Kumar Basu and myself was formed with a view to instituting a permanent fund for the Students' Union. A resolution was unanimously passed by the sub-committee that an annual contribution of annas four ought to be made by each and every student of the college to meet the necessary expenses of the college union. It has also got unanimous approval of the Executive Committee of the Students' Union. But it waits for the final approval of our reverend Principal, the Chancellor of the Union.

* * *

Two societies, Historical Society and Sahitya-Samiti, were formed with reverend Profs. Sambhu Nath Banerjee and Harimohan Bhattacharjee as presidents and Debaprosad Bhattacharjee as secretary and Amiyaratan Mukherjee as Joint-Secretary respectively.

* * *

We are shocked to announce the sudden death of the wife of our venerable Professor Kalidas Sen. We convey our heartfelt condolence to the bereaved family of our professor.

* * *

We saved rupees twenty-five from the Swaraswati Pujah Fund and we sent the amount, though insignificant, to the Mayor's Fund for the help of the distressed people of Monghyr, Patna and Muzzafarpore. We hope, further help from our college is likely to be sent very soon.

Review

(Prof. Mohinimohan Mukherjee)

STUDIES IN PHILOSOPHY: By Prof. Harimohan Bhattacharyya, M.A., published by Motilal Banarsidas, Lahore, 1933. Pages 1-127.

This excellent monograph contains ten philosophical dissertations on a variety of topics, ranging from the much discussed doctrine of Maya and the Jaina philosophical doctrine to some of the most modern and up-to-date philosophical views of the neo-romantic school. All the papers are highly fascinating and thought-provoking, combining in them the ripe scholarship of the writer with his true insight into the subject discussed. His sympathy lies with the absolutism of the Vedanta, though this has not done away with the spirit of intensive living in time. Keenly alive to the progressive adventures in the regions of Science and Philosophy and marvellously lucid in the presentation of his arguments, the writer has brought to bear upon his subject his subtle intelligence that roams at large with an unbiassed mind in the thought-world of Plato and Sankara, Gaudapada and Lord Haldane, Count Keyserling and Sir Radhakrishnan. The most striking feature of the work is the agreeable literary garb with which the writer has clothed his abstruse discussions, which have really furnished for us, in the words of Plato, "a feast of reason and a flow of soul." The writer is thoroughly conversant with the main currents of thought in Indian and European systems of Philosophy, and his range of study is immense. The doctrine of Maya has received a new orientation; the cold light of reason has not imparted to the discourses any rigidity; on the contrary, it has exposed some of the persistent fallacies that have so long created an intellectual miasma. The book is eminently helpful to the B.A. Honours and M.A. students in Philosophy, and we wish it every success. Professor Bhattacharyya will earn the gratitude of all if he continues the series by throwing fresh light on other knotty philosophical problems of this type.

The Book World

(Prof. Bibhutibhushan Ghoshal.)

In England, 14,608 books were published last year. Of these, 10,363 were entirely new publications, and 4,245 were new editions. Fiction was the most numerous class of books, with 2,056 new titles, and 2,384 new editions, making a total of 4,440, including 106 translated novels. The other kinds of books were :— Children's Books and Minor Fiction, 1,372, Educational, 993, Religion and Theology, 856, Biography and Memoirs, 676, Politics and Questions of the Day, 560, and Poetry and the Drama, 525.

In 1932, the total number of books published was 15,279; of these 10,872 were new titles; fiction had 1,996 new titles and 2,650 new editions; Children's Books and Minor fiction were 1,373, one more than in 1933, Educational, 921, Religion, 817, Politics, 702, Brography, 657, and Poetry and the Drama, 491.

A remarkably close parallel. It is to be noted that there is a steady market for about two thousand entirely new novels every year--*more than thirty-eight each week*, and more than an equal number of reprints. (The figures are taken from the *Bookseller*.)

* * *

Messrs. Hodder & Stroughton are offering a thousand pounds for the best piece of autobiographical writing submitted to them before December 31st, 1934.

* * *

Messrs. Cassel in conjunction with an American firm of publishers, are also offering a thousand pound prize. *It is open to the whole world*; it is offered for a novel, containing at least 80,000 words. Mss. must be submitted before Septemebr 1st 1934.

Editorial

New year is before us with new vigour and hope. At the very outset let us first pray to that Unseen Force that habitually brings us to light and eternity. Every morning we receive His grace from the light of the sun, from the dews of this sky and from the melodious chanting of birds. Every night we read His sublimity in the mild ray of the moon and stars. Let us not be fools to ignore the existence of that All-pervading Power. From this day onward let us advise our instinct lest we forget to work in subordination to Him and with a firm faith in His omnipotent existence. Let us send our prayers up to Him that He makes us go forward and not backward in life.

* * *

India is getting poorer day by day. Within a very short time she lost her two gallant, faithful and worthy sons, J. M. Sen Gupta and V. J. Patel. They were political martyrs who considered no sufferings too much, no sacrifice too great for the realisation of truth. They belong to that group of Indians whom India sent out for fame and honour in the service of humanity. Our only consolation is that though they have been brought down by the laws of the flesh, they are deathless in our hearts leading us always to the supreme goal of truth.

* * *

The new College Union has recently been formed with Professor Amal Kumar Ray Choudhury as President. We hope by now it has begun working. We wish to see it fulfilling the hope it has inspired and remedying the defects which were detected in its predecessor.

* * *

About the College athletic we have good news to cater. Cricket has been introduced among us. We wish it success.

Foot ball last year was not remarkable. We request the new secretary and captain for better efforts this session.

* * *

Adverting to world politics, Germany is creating havoc and sensation from minute to minute. Herr Hittler's, rise to power is horror and terror to the westerners. But if Hittler can give stability and peace to Germany, his policy of "blood and iron" will be justfied.

Not only in Germany, everywhere we see the spectacle Democracy in its last gasp. Patriotism, till recently a great virtue in world's history, has now proved itself to be the breaker of peace and co-operation. It has shown the League of Nations up as an illusionary pillar of success. However the game is not up as yet.

Talking of India we find Mahatma is receding from us into mystery day by day. His last six months' activity is difficult to follow. But we have a still unshaken faith in him. It is hoped our country will be freed from chaos and disorder by travelling the path indicated by him.

* * *

The coming of M. C. C. to India is another great sensation of this year. In Bombay, India was beaten fairly, but the rise of Amar Nath relieved the tragedy. Unfortunately, the young star failed at Eden Gardens. In Calcutta our position was saved by Delwar and Captain Naidoo. Delwar proved himself a sound and vigorous hitter, who with a nasty wound on his finger went on hitting merrily. Both Amar Singh and Nissar bowled maintaining a high standard all along. The victorious career of M. C. C. was first checked in Benares by Vijianagram's XI. We are waiting for the Madras Test.

* * *

The moody child's speculations over a dead ant are worth one's while. What, after all, happened in Behar and the districts lying about the Himalayas? One must say that the mighty earth twitched and cracked sending palaces down to the ground. But then the mighty Artist simply rearranged one of his numberless infinitesimally small apartments. A few microscopic growths were beaten into dust in the process. This is another phase of the fact. We kill a few ants and are not morally worse for that. This must be the case with the great Creator who in the execution of His dynamic designs kills quite unconsciously.

But then there is no essential difference between the passing away of Arthur and the extinction of an ant. The smaller, nearer but infinitely more real and practical consideration is that men

have died against their will, husband and wife have been separated, and crippled patients in hospitals have been beatan by the motion of the falling roof. Mahatma says all this is by way of punishing sins. May be the mighty hands guiding us are there with a stone ready for every sin. The sequel of the quake has brought us nearer the truth. But the consolation must not be construed as a triumph. Another thing nonpluses us. The Government's reading of the catastrophe is at variance with the reading of municipalities and other semi-public bodies. Do the Government really underestimate the total loss to life and property ? This action can be excused only on the ground of fighting panic. But then the diplomacy is defective. It fails to untie the string of purse. Up to now there is no foreign help worth the name. Japan had a few crores from outside to repair her loss. India stands the chance of having to do without foreign help.

ERRATUM.

In P. 36 please read "Amiyaratan Mukherjee and Tarinisankar Banerjee as joint-secretaries" for "Amiyaratan Mukherjee as Joint-Secretary."

ASUTOSH COLLEGE MAGAZINE

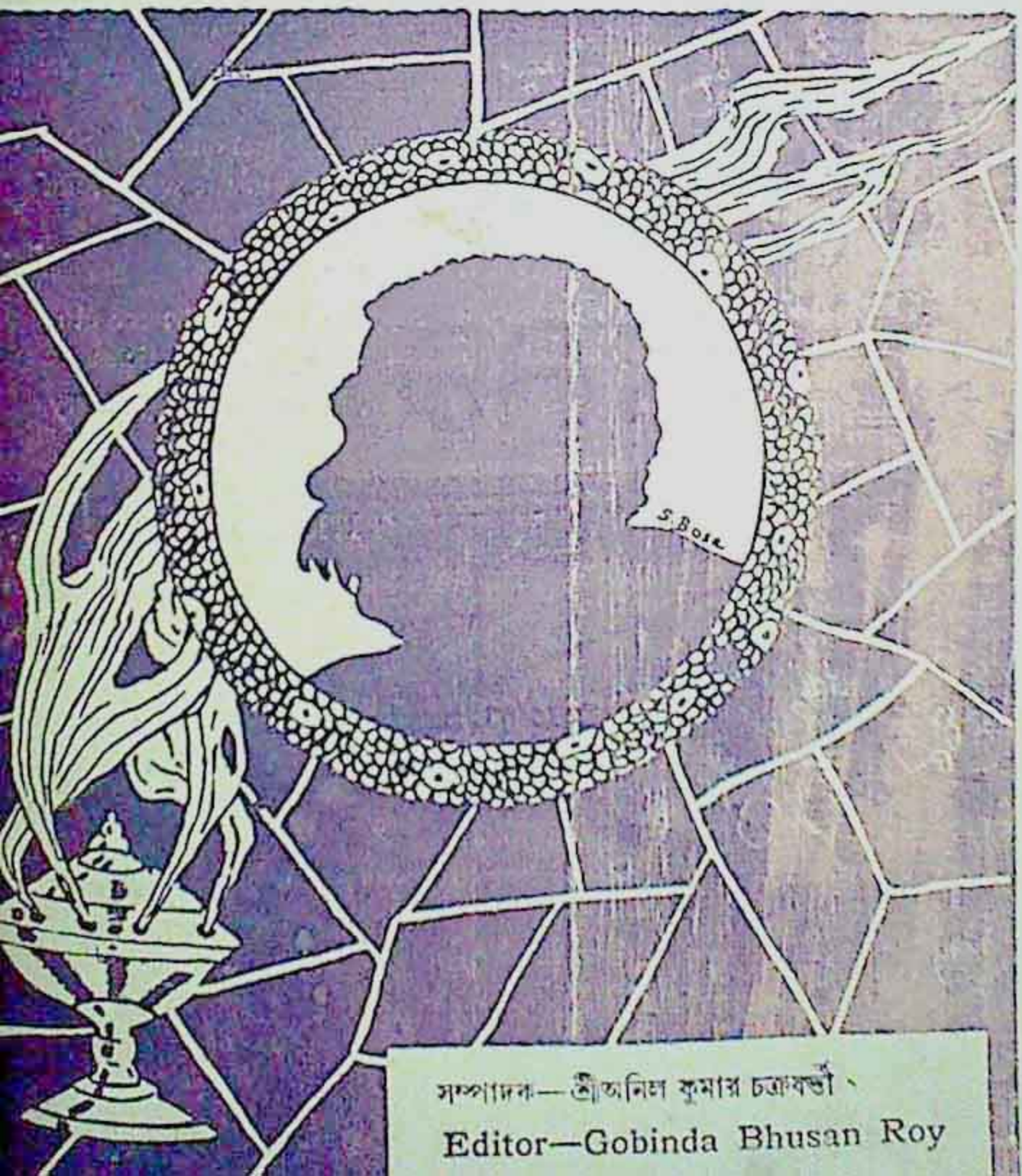

সম্পাদক—শ্রীঅনিল কুমার চক্রবর্ত্তী

Editor—Gobinda Bhusan Roy

NOTICE

Short and interesting articles are invited form students and ex-students of this College. Notes on current topics, gleanings from foreign papers, translation from important books and colections of folk literature of Bengal will be specially welcomed. Articles with a ghter and humorous vein are also invited. As a rule, stories will not be accepted, unless they evince some merit or excellence.

All contributions for publication must be written on one side of the paper and accompained by the full name and address of the writer, not necessarily for publication but as guarantee of good faith.

Contributions should be addressed to the Editors.

Contributors are requested to keep a copy of their articles as the Editors do not undertake the responsibility of returning rejected articles.

There will ordinarily be three issues a year, in September, January and April.

THE EDITORS.

৺বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র)

জন্ম—১লা ডিসেম্বর, ১৯০৮। মৃত্যু—১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৪

Contents

ENGLISH

Subject	Writer	Page
1. Blaze, O Fire	Amiya R. Mukherjee	41
2. Henrik Ibsen	Jyotirmoy Ganguly	43
3. Lotos-eaters	Nikhil R. Banerjee	48
4. The Reverie of a Romantic Girl	Miss Bani Roy	51
5. Battle of Valmy	Deba P. Bhattacherjee	53
6. Review	Prof. M. Mukherjee	56
7. Saraswati Puja Account	Sukesh Banerjee	57
8. Editorial		58

বাঙ্গালা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। মহাত্মা গান্ধী (কবিতা)	শ্রীহরিপদ দাস	৪০
২। অপরাধী (গল্প)	শ্রীসমরেন্দ্র লাহিড়ী	৪৩
৩। ছবি (কবিতা)	শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়	৪৭
৪। বাংলা কাব্যে তারুণ্য-শক্তির উদ্বোধন (প্রবন্ধ)	শ্রীব্রজেন্দ্র দেব	৫২
৫। সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার (বক্তৃতা	শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৫৭
৬। কাব্যকণা (নিবন্ধ)	শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য	৬০
৭। মহেশচন্দ্র ঐ	অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়	৬১
৮। নাড়োড়বান্দা (নাটিকা)	অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল	৬৪
৯। অবেলায় (গান)	ঐ	৬৮
১০। রেফ ও মহাত্মা লোক	অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে	৬৯
১১। ছাত্র-শিক্ষা	ঐ	৭০
১২। চিঠিপত্র	শ্রীতারিণী মুখোপাধ্যায় শ্রীকুমুদ সেনগুপ্ত	৭১
১৩। সম্পাদকীয়		৭৪

ধৈর্য্য তোমার হিমাদ্রি-সম, ওহে সন্ন্যাসী বীর!
সহিয়াছ ঝড় বজ্র-পতন উন্নত করি' শির।
ধূর্জ্জটী সম দাঁড়ায়ে রয়েছ সদা অহিংস-চিতে,
রোধিতে হিংসা দানবের শক্তি বিশ্ব মানব হিতে।

তুমি ভারতের দ্বিতীয় নিমাই সাধক প্রেমের কবি।
"হরিজন"গণ লভিল জীবন তোমার পরশ লভি'।
শুচি অশুচির নাহি ভেদাভেদ তোমার তীর্থ বুকে,
শত্রুরে তুমি মিত্র ক'রেছ প্রেমের গঙ্গোদকে।
"মুসাফির" তুমি বিলাইয়া সব যদিও হয়েছ হীন,
দরশের তরে সকলে পাগল রাজা হ'তে অতি দীন।
ভারতের গুরু নহ তুমি শুধু, বিশ্বের গুরু তুমি,—
সত্য-কমল উঠুক ফুটিয়া তোমার চরণ চুমি।
"জয়তু গান্ধী" "জয়তু গান্ধী" সত্য-কর্ম্ম-বীর,
তমসার মাঝে বিজলীর হাসি বিংশ-শতাব্দীর।

অপরাধী

(অনুবাদ)

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী,
প্রথম বর্ষ (সাহিত্য)

এক

অনেক দিন আগেকার কথা। প্যারি নগরে এক অতি দরিদ্র শ্রমজীবী বাস করত। নাম ছিল তার ক্লড্। সে ছিল অত্যন্ত সৎ। ধর্ম্মপথে থেকে অতি কষ্টে জীবনধারণ ক'রতে সে কিছুমাত্র দুঃখ বোধ ক'রত না। লেখা পড়া সে জানতো না কিছুই, কিন্তু লেখা-পড়া না জান্‌লেও স্বভাবতই সে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ছিল।

বয়স তার ৩২।৩৩এর বেশী হবে না। দেহটি বিশাল, মস্ত চওড়া কপালখানি,—জীবন-যুদ্ধের কঠিন কঠোরতায় ইতিমধ্যেই তাতে কয়েকটী কুঞ্চন প'ড়েছে। কোঁকড়া কাল চুলেও এই অল্প বয়সেই পাক ধ'রেছে। এসব ছেড়ে কিন্তু তার চোখ দুটিতেই ছিল বিশেষত্ব। ঘোর নীল চোখদুটি একাধারে সেই লোকটীর বুদ্ধিমত্তা, আত্মসম্মান-জ্ঞান ও সহৃদয়তার পরিচয় দিত।

সে তার স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্রকে নিয়ে সহরের অতি দরিদ্র পল্লীতে বাস ক'রত। অত্যন্ত কর্ম্মনিষ্ঠ এবং ধর্ম্মভীরু হলেও সে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়েছিল সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপালাভে। নিয়মিত আহারের সংস্থান কোন দিন সে করে উঠতে পারত না। কেটে যাচ্ছিল দিন এইভাবে। এমন সময় এল শীতকাল, সাথে নিয়ে এল তার নিত্য সহচর নানা প্রকার দুঃখ জ্বালা। এতদিন সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সাথে চ'লেছিল তার 'লুকোচুরি' খেলা, সে আশা-নিরাশা-ভরা হৃদয় নিয়ে ছুটে চ'লছিল তাঁকে ধ'রতে। কিন্তু এবার তিনি বুড়ি ছুঁয়ে ফেল্‌লেন। খেলা গেল থেমে। জীবন-যুদ্ধে পরাজয় সম্পূর্ণ ঘটল ক্লডের।

প্যারির শীত, সে যে বড় ভীষণ! ক্লড্ ক্ষুধিত স্ত্রীপুত্রের মুখে একখানা পোড়া রুটি পর্য্যন্ত দিতে পা'রল না, তাদের শীতে আড়ষ্টপ্রায় অঙ্গে একখানা গরম কাপড় দিতে, এমন কি, শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কয়েকটা জ্বালানি কাঠ পর্য্যন্ত সংগ্রহ ক'রতে পারল না।

পেটে অন্ন নেই, গায়ে বস্ত্র নেই,—এই ভাবে কাটল দুদিন। আরতো চলে না। ভাবনায় চিন্তায় ক্লড্ পাগল হ'য়ে উঠ্‌ল। নিজের জন্য সে ভাবে না, কিন্তু তার স্ত্রীপুত্র,—তাদের যে সে বড় ভালবাসে!

কিছুদিন পরের কথা। শোনা গেল চুরি করার জন্য ক্লডের জেল হ'য়েচে। কি সে চুরি ক'রেছিল জানা যায় নি, তার সে চুরির ফলে তার স্ত্রীপুত্র পেয়ে ছিল তিন দিনের খাদ্য, আর ক্লড্ পেয়েছিল পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। ক্লডের প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়ল।

দুই

কারা জীবনের প্রথম কিছুদিন তার অত্যন্ত কষ্টেই কেটে ছিল। কিন্তু কালের পরিবর্তনে সবই সয়ে যায়। কিছুদিন পরে ক্লড ও কারাজীবন যাপনে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। তার কর্মপটুতায় ও বিনম্র ব্যবহারে সে শীঘ্রই কর্তৃপক্ষ ও কারাবাসী সকলেরই প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠ্‌ল।

ক্লড যে বিভাগে কায ক'রত ইন্‌স্পেক্টর মসিয়ে 'ডি' নামে এক ব্যক্তি ছিলেন সেই বিভাগের কর্তা। কারা-কর্তৃপক্ষ যা হ'য়ে থাকেন, তিনিও ছিলেন তাই, তবে তাঁর একটা বিশেষত্ব ছিল—এক গুঁয়েমী। তিনি একবার যা স্থির ক'রতেন, সে মত আর বদ্‌লাতেন না,—তা সে ব্যাপার যতই অন্যায় বা অদ্ভুত হ'ক। তাঁর জীবনে কখন এর ব্যতিক্রম হয় নি'।

ক্লডের দেহটিও ছিল যেমন বিশাল আহারও ক'রত সে সেই অনুপাতে। কাযেই কারাগারের দেওয়া অল্প আহারে তার ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হত না। কারাবাসের কষ্টের মধ্যে একমাত্র এই আহার ব্যবস্থাই তার কষ্টের কারণ ছিল। এ বিষয়ে আরো যন্ত্রণা দিত তাকে মসিয়ে 'ডি'র বিদ্রূপ। মসিয়ে 'ডি'র আহার যে ক্লডের চেয়ে কিছু কম ছিল তা নয়, কিন্তু তাঁর পক্ষে যা সাজে তা কি আর একটা নগণ্য কারাবাসীর পক্ষে সাজে। দুনিয়ার নিয়মই তো এই।

ইন্‌স্পেক্টরের মুখে ক্লডের আহার হ্রাসের উল্লেখ ক'রলেও একটা যুবকের প্রাণে কিন্তু তা অত্যন্ত বাধা দিয়েছিল। একদিন অতৃপ্ত আহারের পর যখন ক্লড্ কাযের ভেতর ক্ষুধার জ্বালা ভুল্‌বার চেষ্টা ক'রছে, সেই সময় একটী যুবক ক্লডের কাছে এগিয়ে এল। যুবকটী অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির এবং বয়স তার অল্প। হাতে তার সদ্যপ্রাপ্ত আহারপূর্ণ পাত্র।

"কি চাও তুমি ?"—রুক্ষস্বরে ক্লড জিজ্ঞাসা ক'রল।

"আপনার কাছে একটা অনুগ্রহ চাই"—ভীতভাবে যুবক উত্তর ক'রল।

ক্লড। কী অনুগ্রহ ?

যু। এই খাদ্যের বিষয় আপনার অনুগ্রহ চাই। এ আহার আমার পক্ষে অত্যধিক।

ক্লড, অবাক হ'য়ে গেল। কিছুক্ষণ সে কথা ব'লতে পারলে না পরে সেই আহার দুভাগে ভাগ করে এক ভাগ নিজে নিল।

যু। ধন্যবাদ আপনাকে। আশা করি আজ থেকে রোজই এ ব্যবস্থা চ'ল্‌বে।

ক্লড। তোমার নাম কি ?

যু। য়্যাল্‌বিন্।

ক্লড। এখানে এলে কি করে' ?

যু। চুরি করে'।

ক্লড। আমিও চুরি করে'।

ছোট একটা ঘটনা, কিন্তু এই থেকে দুজনের যে বন্ধুত্ব হ'ল তা কিন্তু একেবারেই ছোট নয়।

দুজনের মাঝ থেকে বয়সের পার্থক্য উঠে গেল। ক্রমে এমন দাঁড়াল যে কেউ কারো অদর্শন সহ্য ক'রতে পারত না দিন রাত তারা এক সাথে থা'কত। সহানুভূতি এমনই জিনিষ—এমনি করেই সে পরকে আপন করে।

তিন

য়্যালবিনের সাথে ক্লডের এই ব্যবহার কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরের চোখ এড়ায় নি। কিছুদিন পরে দেখা গেল য়্যালবিন্‌কে অন্য বিভাগে বদলি করা হ'য়েছে, শোনা গেল ইন্‌স্পেক্টরের আদেশ। এর যে বিশেষ কোন কারণ ছিল তা নয়। অপরকে ব্যথা দেওয়ার আনন্দ এবং নিজের যে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে তার পরিচয় দেওয়াই বোধ হয় এর কারণ ছিল।

ক্লড্ যখন এই খবর জান্‌তে পারল, ব্যথায় তার সারা মনটা ভরে উঠ্‌ল। য়্যালবিন্‌কে ফিরিয়ে আনার সকল চেষ্টাই সে ক'রেছিল, আর হ'য়েছিল বিফল। দিনে দিনে সে ম্লান হ'য়ে যেতে লা'গল। তরুণ বন্ধুকে হারাণ'র ব্যথার সাথেই তার প্রাণে বেজেছিল আর একটী ব্যথা,—অতৃপ্ত আহারের ব্যথা। কারণ তরুণ বন্ধুর ভালবেসে দেওয়া আহারও সে হারিয়েছিল তরুণ বন্ধুকে হারাণ'র সাথেই। অবশ্য আরো অনেকেই ক্লড্‌কে তাদের খাদ্যাংশ গ্রহণ ক'রতে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু সে কারো অংশই গ্রহণ করেনি।

ইন্‌স্পেক্টরের কাছে ক্লডের অনুরোধ, উপরোধ, দয়াভিক্ষা সবই হ'ল বিফল। উত্তর একই "আমি একবার যা স্থির ক'রেছি তা আর বদল্ হতে পারে না।" বড় ভালবেসেছিল সে—য়্যালবিনের বিচ্ছেদ তার অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। একদিন সে ইন্‌স্পেক্টরকে নির্জ্জনে ডেকে বল্‌লে, "মসিয়ে, আজ অক্টোবর মাসের ২৫শে। আমি আপনাকে নভেম্বর মাসের ৬ঠা পর্য্যন্ত সময় দিলাম, য়্যালবিন্‌কে ফিরিয়ে না দিলে আপনার ভাল হ'বে না।" ইন্‌স্পেক্টর তাকে সাবধান করে দিলেন এবং বল্‌লেন, "তার এই প্রথম অপরাধ বলে ক্ষমা করা গেল, কিন্তু ভবিষ্যতে সে যেন সাবধান হয়ে চলে।" দ্বিতীয় বার তাঁকে সাবধান ক'রতে গিয়ে ক্লড্, ২৪ ঘণ্টার জন্য নির্জ্জন কারাকক্ষে আবদ্ধ হোল।

* * *

চার

কিছুদিন পরের কথা। ইন্‌স্পেক্টরের ওপর ক্লডের সারা মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। প্রতিশোধ নেওয়াই সে স্থির ক'রে ছিল। যতই দিন যেতে লা'গল, ততই ক্লড্ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হতে লা'গল।

* * *

ক্রমে এল ৬ঠা নভেম্বর। সন্ধ্যা সাতটার সময় কয়েদীদের কারাকক্ষে আবদ্ধ করা হ'ত। সাতটার সময় আস্‌তেন ইন্‌স্পেক্টর, কয়েদীরা ঠিক্ আছে কিনা দেখ্‌তে। সেদিনও এলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি যখন ক্লডের সামনে এলেন, ক্লড্ উঠে দাঁড়িয়ে টুপি উঠিয়ে তাঁকে অভিবাদন ক'রল। তিনি দাঁড়ালেন, জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কিছু ব'লবার আছে।

ক্লড্। য়্যালবিন্‌কে কি আপনি কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারেন না?

ই। না। কতবার ব'লব?

ক্র। কেন আপনি তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিলেন?

ই। কারণ আমি ঐ রকম ইচ্ছা ক'রেছিলাম; অন্য কারণ নেই।

ক্র। তাহ'লে আপনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন না?

আর কোন উত্তর না দিয়ে তিনি এগিয়ে চ'ল্লেন। ক্রড্ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল, অল্পক্ষণ, মুহূর্তমাত্র, কি যেন ভেবে নিল। তারপর ভীষণ কণ্ঠে ব'লে উঠল, "আজকে ৪ঠা নভেম্বর, মসিয়ে।"

* * *

পাঁচ

তারপর! তারপর ক্রড্কে দেখা গেল হাসপাতালে। প্রহরী আর চিকিৎসক বেষ্টিত ক্রড্। সেই রাত্রেই, ৪ঠা নভেম্বর রাত্রেই, সে মসিয়ে 'ডি'কে হত্যা করে। তারপর নিজেও সে আত্মহত্যা ক'রতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয় নি। তবে তারই ফলে তাকে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল।

* * *

ছয়

এইবার ক্রডের জীবনের শেষ অভিনয় আরম্ভ হল। সে বেশ সেরে উঠেছে। এবার তার বিচারের পালা। আর একবার ক্রডকে বিচারালয়ে দেখা গেল, তবে এবার আর চোর নয়—এবার হত্যাকারী। বিচারে সে শুধু তার জীবন-ইতিহাস বর্ণনা ক'রে গেল। সে দোষী কি নির্দোষ কিছুই ব'ললে না।......বিচার শেষ হ'য়ে গেল।

বিচারপতি জুরীদের ক্রডের বিরুদ্ধে অভিযোগ বুঝিয়ে দিলেন। তিনি আরও ব'ল্লেন যে, এরূপ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের কথা তিনি অল্পই শুনেছেন।—মানব সমাজ ও সভ্যতার শত্রু এরা—নরবেশী রাক্ষস বিশেষ—, প্রাণদণ্ডেও এদের অতি অল্প শাস্তি হয়—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অতঃপর তিনি ক্রড্কে জিজ্ঞাসা করলেন 'তার কিছু বলবার আছে কিনা?' ক্রড জুরীদের দুটী প্রশ্ন করবার অনুমতি চাইলেন। বিচারপতি অনুমতি ক'রলে, জুরীদের সম্বোধন করে সে ব'লতে আরম্ভ ক'রল,—"আপনারা আমায় যে কোন শাস্তি দিন, আমার কোন অনুযোগ নেই। আমার অপরাধের বিচারের সাথে আপনারা আমার দুটী প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে আনবেন। প্রশ্ন দুটী,—কেন আমি চুরি করেছি, আর কেনই বা আমি হত্যা করেছি? আপনারা ত আমার জীবন-কাহিনী শুনেছেন, এইটী প্রশ্নের উত্তর দিতে আশা করি আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। আপনাদের কাছে এই দুটী প্রশ্নের উত্তরই শুধু আমার প্রার্থনা, আর আমি জানি যে আপনাদের কাছ থেকে এর যথার্থ উত্তরই পাব।"

* * *

শেষ

ক্রডের জীবনের শেষ অঙ্কে যবনিকা প'ড়ল। বিচারে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'ল।

তার মত একটা ধর্মপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ, মহান্‌ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল এইভাবে। তার জীবনের এই পরিণাম শুধু একটু সুযোগ অভাবে। একটু সুযোগ পেলে কত বড়ই না সে হ'তে পারত ......

জুরীরা ক্রুডের বিচার ক'রেছিলেন বটে, কিন্তু তার প্রশ্ন কটীর বিচার করেননি ; সে তার প্রশ্নের উত্তর পায়নি। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা আপনাদের উপর তার সেই প্রশ্ন কটীর উত্তরের ভার দেওয়া গেল।

ছবি
(কাহিনী)

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ (সাহিত্য)

ওইখানে ওরা ছিল ।......

ওই—ওই খানে, যেখানে দাঁড়ায়ে বটগাছ—
শতানে শতানে ঝুরোগুলো মেলে শিবের জটার মতো ?
ওই যে গো, ওই গাছের সামনে সুবিপুল সরোবর—
যার বুকে নাচে বাতাসে দুলিয়া শতেক পদ্মফুল ?
হংস-হংসী মরাল-মরালী ঝাপটিয়া ডানা সুখে
যেথা গান গায় ?—ভাসিয়া বেড়ায় অপূর্ব কৌতুকে ?......

দেখিতে পাও না ?......আকাশ ছোঁয়ানো তেঁতুল-গাছটা দ্যাখো,
ওই গাছটা গো, ডালে ডালে যার ঝুলিছে বাদুড়গুলো—
আর কোণে কোণে পাখীদের সব কুণ্ডলী-করা-বাসা,—
ওরই দক্ষিণে দশ হাত গেলে মিলিবে তাদের বাড়ী !
হাঁগো, ওই বাড়ী,—সামনে দেখছ মণিমঞ্জরী-লতা—
ফুলে ফুলে ভরে বাতাসে নাচিয়া কহিছে তাদেরি কথা !!...

সেদিন প্রথম দেখেছি তাদের হঠাৎ গেছিনু তাই—
কেন জানি নাক ;—গেছিলাম শুধু এইটুকু মনে আছে।
মেয়েটি আমারে অসীম আদরে বসিতে আসন দিল,
থালা ভরে মোরে মিষ্টি ও ফল হেসে দিল 'জল' খেতে !
'দাদা' বোলে মোরে ডেকেছিল ভাই—তাই তারে ভুলিনি যে,
তাদের কথা তো শুধাওনি, তবু বলিতেছি যেচে নিজে !

মেয়েটির স্বামী রোজ ভোর বেলা পাটকলে চলে যেতো,
মেয়েটি একেলা ঘোরে খিল দিয়ে নিভৃতে করিত কাজ !
সুতো কাটা, আর জাল বোনা, আর পশমের কাজ কোরে'
খাবার খরচ চালিয়ে সে নিতো।...কষ্ট ছিল না কোনো !
স্বামী পেতো দিন আট আনা কোরে' সেটা হোতো শুধু জমা,
কই কোথায় নারী যদি হয় কল্যাণময়ী রমা ?

ওই গৃহে তারা স্বামী আর স্ত্রীতে পরম-সুখে ও প্রেমে—
কাটাইত দিন; আমি উহাদের মাঝারে সহসা গিয়ে
আরো সুখ যেন জাগায়ে তুলিলাম;—কিন্তু সে-সুখ ভাই
পাড়ার সবার সহ্য হোলো না, জ্বলে মলে তারা নিতি।
পাড়ার লোকেরে গ্রাহ্য করি না তবু যার ইচ্ছায়
মানুষ চলিছে, সেই নিয়তিরে—হেলা কভু করা যায় ?

• • • •

আমি ব্রাহ্মণ, জাতির শ্রেষ্ঠ, ওরা মজুরের জাতি,
সবাই তো ভাই মিলনে মোদের বড়ই ব্যস্ত হোলো !
এমনি কোরেই ছোটলোক গুলো উঠে বসে মাথা'পরে,
ব্রাহ্মণ হোয়ে ওদের বাড়ীতে কেন ঘন ঘন যাওয়া ?
শুধু তাই নয়, আমি নাকি ভাই সেদিন ওদের হাতে
মাছ নিয়ে ভাত পেট পুরে খেয়ে ফিরেছি দুপুর রাতে।

গোঁড়াদের আর ঘুম হোলো নাক।—কেমনে হইবে ঘুম,
ধর্ম্ম বড়ো, না ঘুম বড়ো, ভাই, সেই কথা ভাবো দেখি ?
কতো উপদেশ দিয়েছিল তারা, এ-কানের মাঝে জমি'
ও-কান দিয়ে তা বাহিরিয়া গেছে, তাই অনর্থ হোলো !
ভাই-বোনে আমি ভালবাসি, তাই অনর্থ আসে যদি,
কি করিব ?—মোরে সে লাজ সহিতে হয়, হোক নিরবধি !

গাঁয়ের লোকেরা কি রটিয়ে ছিল জানি নাকো ভাই মনে,
সেদিন ওদের বাড়ী গিয়ে আমি অবাক হইয়া গেনু !
সে-বোন আমারে কাছে পেলে যেন স্বর্গ পাইত হাতে,
মোরে নিয়ে সে যে কি করিবে তার ঠিকটি থাকে না কোনো,
সেই বোন মোরে হেরি' সরে' গেল, দূর হোতে শুধু বলে—
'আর তুমি দাদা এসোনা এখানে, এক্ষুণি যাও চলে !'

বিস্মিত হয়ু, দাঁড়ায়ে রহিনু কাঠের পুতুল সম,
সে বলিয়া চলে : 'লজ্জা করে না চাষীর মেয়ের তরে
অতো বড়ো হেয় নিন্দা সহিতে ?...কেন আসো তুমি হেথা ?
আমি তো তোমার কেউ নই, তুমি কি পেতে এখানে আসো ?
চলে যাও আর এসো নাকো কভু ।'—বলিতে বলিতে ছুটে'
আমার চরণে লুকারি' কাঁদিয়া সহসা সে পড়ে লুটে ॥...

কিছু বুঝি নাই, চিত্রের মতো শুধুই দাঁড়ায়ে র'নু—
তারপর ধীরে অতি ধীরে আমি ক'নু তার হাত ধরে' ।
'কি শুনেছ তুমি—জানি নাক বোন, তবু তুমি বলিতেছ
বেশ, আমি তাই এ-বাড়ীতে ভাই আর কভু আসিব না !"
এই বলি তার মাথে হাত রাখি করিনু আশীর্ব্বাদ—
'চিরসুখী হোয়ো স্বামী-সোহাগিনী, পুরুক মনের সাধ !"

'কভু আসিব না'—পণ করেছিনু, রাখতে পারি নি পণ,
দশদিন বাদে পুনঃ গিয়েছিনু;—শুনেছিনু দূর হোতে—
বোনের আমার বেজায় অসুখ, তাই তারে দেখিবারে
যেতে হোয়েছিল;—তারে না দেখিয়া মনও কেঁদেছিল বড়ো !
রোগ শয্যায় শায়িতা ললনা,—ডাকি তারে স্বামী কহে :
'কে এসেছে ভাখো,—দাদা এসেছেন ।'

কহে সে : 'ও দাদা নহে ।

ওতো দাদা নয়, স্বামী হোতে চায়, হা হা রে বামুন স্বামী !
একটা স্বামীতে মেটে নাক আশা, এইবার ছুটো হবে ।
একটা মজুর, একটা বামুন—মিলিয়া যাইবে ভালো;
তুমি কি শোনো নি বামুন-মেয়েরা আমায় কি বলে গেছে ?
তাড়াও—তাড়াও, ভালো-লোক নয়, তাড়াও, তাড়াও ওরে,'—
টলিতে টলিতে উঠি সে বসিল ঘোর বিকারের ঘোরে ।
বুকের মাঝারে হাতুড়ী বাজিল; এত বড় ছোট কথা ?
প্রাণে প্রাণে মোর শিরায় শিরায় জাগাইল বিদ্রোহ !
ধীরে ধীরে আমি পা বাড়ানু যেন—ফিরিয়া আসার তরে,
ভগ্নী সহসা ডাকিল আমায়; বুক ভরে অভিমানে !
শয্যার পানে গেলাম তাহার, কেন যে ডাকিল মোরে
বুঝি নাই; সে তো কথা কহে নাই—ছিল বিকারের ঘোরে !

পাড়ায় পাড়ায় রটে গিয়েছিল আমি চরিত্রহীন,
এমন কামুক, বিয়ে-করা মেয়ে বিয়ে করিবারে চাই !
চাষীর মেয়েটি সতীর প্রতিমা,—তাই মোর কাম আশা
হয় নি সফল; কানে 'মালা' নিয়ে ঘরে শুয়ে রহিলাম !
যারে ভালবাসি সেই মোরে হায় বুঝিয়াছে ভাই ভবে—
কুটিল মানুষ বুঝিবে যে, তায় অবাক কি তুমি হবে !

সদাগর(ওই মেয়েটির স্বামী) সেদিন আসিয়া বলে—
'তোমার কৃপায় এ-যাত্রাটায় বেঁচেছে তোমার বোন ।
তুমি যদি দাদা খরচ না দিতে বিনা ওষুধেই ভাই
কোন সন্দেহ নাই দাদা, তারে ফিরে না পেতেম আর ।
ক্ষমা করো দাদা, ক্ষমা করো তারে, অসুখের ঝোঁকে সে যে,
অপমান তোমা করেছিল হায় !'

...এতে কি রে মন ভেজে ?...

তবু বলেছিনু : 'ক্ষমা তো করেছি ?'—সদাগর কয় পুনঃ,
'চাষীর মেয়ে সে অ আ ক খ শিখে ধরারে ভেবেছে সরা;
তুমি যে দেবতা আমি জানি ভাই, শুনো না লোকের কথা,
চলো বাড়ী মোর, মাথা খাবে ভাই যদি নাহি কথা শোন'।
আমি বলেছিনু : 'দেবতা যে নই, আমি যে মানুষ, ভাই—
সেই কথাটাই বলে যাও—মোর যেতে যে ইচ্ছা নাই !,

সেদিন সকালে আবার দেখিনু আসিয়াছে সদাগর—।
'কি খবর ?'...আমি উদাসীন ভাবে তারে ধীরে কহিলাম ।
আমতা-আমতা করি সে কহিল;—'প্রার্থনা রাখো দাদা,
তোমার ঘরের ওই ছবিখানি আজি মোরে দিতে হবে ।'
বিস্ময়ে তারে কহিলাম আমি 'ও তো 'ফটো' মোর ভাই ?'
মাথা নেড়ে সে কহিল মৃদু-ধীরে—'হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ছবি চাই ।

• • •

বিদেশে গেছিনু; ফিরিয়া দেখিনু তারা আর হেথা নেই,
বসন্ত এসে বসন্তদিনে নিয়ে গেছে তাহাদের ॥
মণি-মঞ্জুরি-লতা দোল খায় বাতাসের দোলনায়—
আকাশের-নীল মেখেছে নীলিমা ফুলে-ভরা-লতাবুকে ॥...

দুটী সাপ নাকি ওই বাড়ীটায় জড়াজড়ি কোরে আছে—
যে যায়, তাহারে তেড়ে আসে—তাই যায় নাকো কেউ কাছে!
পাড়ার লোকেরা দেখেছিল নাকি মণি-মঞ্জুরী-তলে
তাহারা দুজনে কুহুস্বরে গান গাহিত দুপুর রাতে।
মেয়েটা যে নাকি হোয়েছে পেত্নী—ছেলেটা হোয়েছে ভূত,
মানুষ এলেই খেতে আসে তাই ভয় সে ভয়ঙ্কর!
সকলে আবার দেখিয়াছে নাকি আমার ঘরের পাশে—
অমাবস্যার রাতে দুজনেই উল্লাস ভরে হাসে!

সেদিন কি জানি কি যে মনে হোলো—বন-জঙ্গল ঠেলে'—
পরম-বন্ধু সুবোধের সাথে তাদের বাড়ীতে গেনু।
সাপেরা তখন বাড়ী ছিল নাক' দিনে ভূত থাকে নাক,
তাই নাকি মোরা প্রাণ নিয়ে ভাই ফিরিতে পেরেছি পুনঃ।
বোনটী যে ঘরে করিত রে পূজা, জানি নাক সেই ঘরে,
সহসা আমার সুবোধ-সুহৃদ পশে কৌতুক-ভরে!

আমি চারিভিতে ঘুরিতে ছিলাম স্মৃতি ভরা মোর বুকে—
বেদনায় মোর চেতনার-বীণা কাঁদিছে আকুল সুরে!
সহসা শুনিনু করুণ কণ্ঠে সুবোধ ফুকারি' উঠে,
আমি ছুটে গেনু; তাইতো হোলো কি?—সাপের ভয় যে বড়!...
গিয়ে দেখিলাম: দেওয়ালের গায়ে টাঙান আমার ছবি,—
চন্দন-রেখা আঁকা তাহে,—হেরি কাঁদিছে বন্ধু কবি!

শুষ্ক-ফুলের মালাটি রোয়েছে ছবিটার চারিপাশে—
তলায় রয়েছে লেখা:

"ক্ষমা কোরো"

ইতি অভাগিনী রমা।

সুবোধ রোহিল স্তব্ধ নীরব; আমি তারে কহিলাম—
চলো চোলে যাই,—শুনিয়াছি ভাই এ-বাড়ীতে ভূত আছে।
বন্ধু চাহিল ছবিখানি নিতে; আমি কহিলাম তারে:
"নিওনাকো, তা'লে ভূত দেখা দেবে রেতের অন্ধকারে!"

* * *

শেষ হোয়ে গেছে; আর লিখিবার কিছুতো আমার নাই।
আমার ছবির কথাতো শুনিলে?—সাথে নাই ভালো জানি।

তোমরা শুনেছ অনেক কাহিনী, হৃদয়-কাঁপিয়ে-তোলা
অঘটন সব ঘটনায় ভরা, এটা যে নেহাৎ বাজে ?
হোক বাজে, তবু ভুলিনিকো এরে;—শুভ-যৌবন প্রাতে—
আঁকা যে হোয়েছে এই-ই ছবি,—মোর জীবনের খাতা-পাতে ॥

শেষ।

বাংলা কাব্যে তারুণ্য শক্তির উদ্বোধন

শ্রীব্রজেন্দ্র দেব, তৃতীয় বর্ষ (সাহিত্য)

জয়দেবের বাংলায় চণ্ডীদাসের পবিত্র প্রেম প্লাবিত বাংলায়—প্রেমের কবিতার জন্মলাভ হয়ত' বিস্ময়কর ঘটনা নয় তবে বিস্ময়কর হয় তখনই যখন আমরা দেখি পবিত্র প্রেমের মুখে কামের কদর্য্য কালিমা। প্রেম যে মানুষের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি সে কথা আমরা অস্বীকার করিনে। কামও যে মানুষের একটা সহজ স্বাভাবিক বৃত্তি নয় তা' নয়। তবে প্রেমের কবিতা যে মানুষকে কোন দিন কর্ম্মপ্রেরণা দিয়েছে সে কথা আমাদের জানা নেই। প্রেমের কবিতা হয়ত' মানুষের মনের খোরাক যোগাতে পারে কিন্তু সভ্যিকারের মানবতার সেইটেই যে সব এমন কথা আমরা কেমন করে বলি। প্রেম সাহিত্যজগতের সবটুকু আসন কোন দিনই দখল করে রাখতে পারে না—কেননা যুগে যুগে দেশে "তারুণ্য শক্তি" প্রবলবন্যার মত ছুটে আসে ধরিত্রীতে সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে—শিবের উপাসনা করতে—সুন্দরের পূজা করতে।

দেশের যখন দুর্দ্দিন—সাহিত্য যখন অপমানিত তখনও এই তারুণ্য-শক্তির অভ্যুদয় হয় অসত্যের বিনাশ করতে—

"পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"

যেমন শ্রীকৃষ্ণ আসেন কুরুক্ষেত্রে,.....তারুণ্য-শক্তির কবিরাও তেমনি সাহিত্যাকাশে উল্কার জ্যোতিষের মত উদিত হয়ে অসত্যের অন্ধকার হ'তে আলোকামৃতকে উদ্ধার করেন, বলেন :—

"অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।"

আমাদের আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে যে যুগ এসেছে। সে যুগ যে এসেছে তার প্রথম সূচনা পাই আমাদের প্রথম তারুণ্য-শক্তির কবি **কাজি নজরুল ইস্‌লামের** কবিতায়—

"আস্‌ছে এবার অনাগত প্রলয় নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক্ হেনে ভাঙ্‌ল আগল।
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে
ধূম্র-ধূপে
বহ্ন-শিখার মশাল জ্বেলে আস্‌ছে ভয়ঙ্কর—
ওরে ওই আস্‌ছে ভয়ঙ্কর।"

তাঁর এই ভয়ঙ্কর নিনাদে সকলের তন্দ্রা ছুটে গেল কিন্তু তাদের নেশা ছুট্‌ল না। তখন তারা ব'লে উঠ্‌ল—"ওগো কবি তুমি কেন এম্‌নি ক'রে আমাদের প্রেমের কবিতার রাজ্যে তোমার এই অগ্নিময়ী বাণী আন্‌লে—এযে সব পুড়িয়ে দেবে, সব ভেঙ্গে দেবে। ওগো কবি, বন্ধ কর তোমার ও কবিতা—তুমি এমন করে আমাদের সাধের কুঞ্জ ভেঙ্গনা,—তাকে এমনি করে নষ্ট ক'রো না।" তখন কবি আবার তাদের শোনালেন সেই 'মাভৈ' বাণী—বল্লেন :—

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন-জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আস্‌ছে হেসে—
মধুর হেসে!
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!"

মোহ নিদ্রায় ছিলুম, বেশ ছিলুম—কিন্তু কার উন্মাদ আবাহনে সে নিদ্রা ছুটে গেল—কে যেন বল্‌লে "ওগো তুমি ক্ষুদ্র নও, না কখনই ক্ষুদ্র নও।

"বল বীর
বল—চির উন্নত মম শির।"

এ যেন অগ্নিঋষি স্বামী বিবেকানন্দের জ্বালাময়ী বাণী। "Man, think yourself great—think yourself divine; Move this heaven and earth with your lion-strength." নিদ্রা ছুটে গেল, উঠলুম, তারপর যখন এই বিশ্বের দিকে তাকালুম... কী দেখলুম...কী ভীষণ অত্যাচার। ভাবলুম আমি সামান্য মানুষ, আমারদ্বারা কী এত অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব? মনে আবার ক্লীবত্ব এ'ল কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে মোহ নিদ্রা ছুটে গেল যখন শুন্‌লুম।

"মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।"

নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হলুম। কিন্তু একী! এযে আমি উন্মাদ হ'য়ে বিশ্বের যত কিছু বাধা যত কিছু বিপত্তি তুচ্ছ করতে সমর্থ। তাই কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইলুম—

"ওরে—আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ
আমি সহসা চিনেছি আমারে, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।"

তাই আজ বাঙ্‌লার যুবশক্তি উন্মাদ হ'য়ে ছুটেছে। যখন সে দেখতে পেলে তার সাধের কাব্যে প্রেমের নামে কদর্য্য কামের উপাসনা হচ্ছে তখন সে আর নিশ্চিন্ত মনে তা সহ্য করতে পারলে না। সে নির্ভয়ে বলে উঠল। এ অত্যাচার আমি সইব না। কারণ আমি বিদ্রোহী, এই কদর্য্যতার বিরোধী—এই অত্যাচারের বিপক্ষে। তাই সে এই শ্রেণীর দীনতা, হীনতা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ ঘোষণা করলে—সে শুনতে পেলে এই হীন অত্যাচার প্রপীড়িতা, দীনা, ক্ষীণা বঙ্গভাষার ক্রন্দন। সে আর ধীর শান্ত হ'য়ে থাকতে পারলে না সে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিদ্রোহীর সুরে ব'লে উঠল—

"মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
যবে অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।"

এমনি ভাবে কবি কাব্য সাহিত্যের মাঝ দিয়ে আমাদের মোহ নিদ্রা দূর ক'রেছেন। এই ভাবে বিদ্রোহের আগুনে বাঙলা সাহিত্যের যা কিছু অসুন্দর, অ-শিব, অসত্য, তাকে ভস্মীভূত করে সত্য-শিব-সুন্দরের মূর্ত্তি দেবার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে একথা আমরা বলতে পারি তিনি যে শুধু যুবকের এবং যুব-শক্তির গান-ই গেয়েছেন তা' নয়। তিনি দেশের এই যে দীন দরিদ্র, অশিক্ষিত তাদের কথা কত বড় ক'রে ভাবেন তার প্রমাণ তাঁর 'সর্ব্বহারা'। তিনি জাতীয়তার গান গাইতে গিয়ে কখন গোঁড়া হ'য়ে পড়েন নাই বলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণযেখানে তিনি কোন গলদ দেখেছেন, সেখানে পরিষ্কার ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন—যেমন...

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দু'টো ভাত একটু নুন।
বেলা বয়ে যায়, খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন!
কেঁদে ছুটে যাই পাগলের প্রায়
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুণ—
কেন উঠে নাক' তাদের গালে যারা খায় এই শিশুর খুন!

কবি নজরুলের কাব্য দেশ কালের গণ্ডীবদ্ধ—এমন কথা অনেকেই বলে থাকেন। আমরাও তা' অস্বীকার করিনে। বিংশ শতাব্দীর দেশ ও কাল গত হবার পর যে দিন নূতন যুগের—সাম্যবাদীর—আদর্শবাদীর যুগের অভ্যুদয় হ'বে, সেদিন এই কবির কাব্য আদৃত নাও হ'তে পারে কিন্তু তাই বলে আমরা যদি এখন অর্থাৎ এই যুগে তাঁর লেখার অন্তর্নিহিত শক্তিকে অস্বীকার করি তবে আমরা তাঁর প্রতি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের প্রতি খুব অন্যায় করব। কেন যে তিনি উচ্চাঙ্গের কোন কাব্য সৃষ্টি করেন নি বা করতে পারেন নি তার কারণ তিনি নিজেই দিয়েছেন—

"বন্ধুগো আর বলিতে পারিনা, বড় বিষজ্বালা এই বুকে।
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে॥
বড় কথা বড় ভাব আসে নাক বন্ধু বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও বন্ধু যাহারা আছে সুখে।

কাজি নজরুলের পরই আমাদের মতে কবি **সাবিত্রী প্রসন্নের** স্থান হওয়া উচিত। যদিও তাঁর লেখায় তারুণ্য শক্তির সুর নজরুলের কিছু আগে থেকেই ছিল কিন্তু তাঁর সেই সুর নজরুলের চেয়ে নিম্ন গ্রামে ছিল বলেই মনে হয়েছে। সেই দিক থেকেই দেখতে গেলে আমরা 'Pioneer' of the age বলতে পারিনা কি? এইবার সংক্ষেপে আমরা তাঁর কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলবার চেষ্টা করব। আমাদের মতে তিনি একজন তারুণ্য শক্তির কবি। তাঁর "আহিতাগ্নি" মানুষের দুঃখের, দৈন্যের ব্যাকুলতার বিপুল উচ্ছ্বাস। সাবিত্রী প্রসন্নের অনেক লেখায় রবীন্দ্রনাথের ছায়া পড়েছে ব'লে আমাদের মনে হয়েছে। কিন্তু এ কথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে স্থানে স্থানে তাঁর প্রতিভা বিশ্বকবির আলোক এড়িয়ে চলতে সমর্থ হ'য়েছে। সাবিত্রী প্রসন্নকে আমাদের একজন উঁচুদরের কবি বলে মনে হয়েছে।

এই ধরণের মন্তব্য করার পর আমাদের উচিত ছিল তাঁর দুই একটী কাব্যাংশে উদ্ধৃত করা। কিন্তু সময় অভাবে এবং তাঁর বইগুলি এখন কাছে না থাকাতে সেটা করা সম্ভব হ'ল না। যদি পরে সময় এবং সুবিধা পাওয়া যায় তবে আরও একটু ব্যাপক ভাবে বলবার চেষ্টা করা যাবে।

নজরুলের গানের রেশ টেনে চলেন কবি **নিতাইবালা**। তাঁর লেখা সাধারণতঃ নজরুলেরই অনুরূপ। তাঁর লেখা পড়লে আমাদের মনে হয় তাঁর আহরণ শক্তিটী বড় চমৎকার। তিনি ক্রমাগত যেখানে যে কাব্যের সুন্দরাংশ উপভোগ্য তা' আহরণ করে নিজ কবি প্রতিভায় তাকে তরুণের সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁর লেখায় এপারের রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং ওপারের 'শেলী' ও 'বাইরণ' একাধারে স্থান লাভ করেছেন। তাঁর রচিত 'সব হারাদের গান' যে কতখানি যুগোপযোগী হ'য়েছে তা পড়লেই আমরা অনুভব করতে পারি। তাঁর এই পুস্তকে 'সবহারাদের' কথাই বড় ক'রে বলেছেন। নজরুল যেমন

যুবজনের কথাই বড় ক'রে বলেছেন কবি বিজয়লাল তেমনি—এই যে মথিত পায়ে দলিত অভাগা চাষা, মজুর, কুলির কথাই বড় ক'রে বলেছেন নজরুলের কাছে যে ভাবে যুবকের,—যুবশক্তির.....হুরবস্থা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল ঠিক সেইভাবেই এই নিম্নশ্রেণীর হুরবস্থা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল কবি বিজয়লালের কাছে। তাই তিনি গেয়েছেন তাদের গান সকলের চেয়ে বড় ক'রে। এই দিক থেকে বিচার করার পর আমাদের মনে হ'য়েছে যে তাঁকে একজন তারুণ্য শক্তির কবি বলা যেতে পারে। বিজয়লালের ভাষার তেজ আমাদের তাঁর অন্তরের যৌবন শক্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এতবড় সরল, নিরভিমান কবি বাঙলা দেশে ক'জন আছেন আমরা তা' বলতে পারি না।

সাহিত্য বলা যেতে পারে হুশ্রেণীর—জাতীয়-সাহিত্য ও বিশ্ব-সাহিত্য। অনেকে এ কথা প্রায়ই ব'লে থাকেন যে জাতীয় সাহিত্যের আয়ুষ্কাল অতি অল্প। কিন্তু কবি **শিবরামের** কবিতা পড়বার পর সে কথার ত' অর্থই আমরা পাই না। **শিবরামের** হুরন্ত-কাব্য শক্তি যুগের মাঝে থেকেও অনন্ত যুগের অন্তরালোকে চলে গেছে। তাঁর কবিতা—তাঁর নিজস্ব কবিতা। "মানুষ" পাঠ করে আমাদের মনে হয় এত বড় প্রতিভা সম্পন্ন কবি তরুণ বাঙলায় আর হুটী নেই। রবীন্দ্রনাথের পরেই, আমাদের মনে হয় হু'টী অনন্ত কালের কবি এসেছেন—একটী মোহিতলাল ও অপরটী আমাদের এই...শিবরাম। কাব্যের আসরে propaganda'র সুর বজায় রেখে প্রকৃত কবিতার সৃষ্টি কেবল শিবরামেই সম্ভব হয়েছে। নজরুল, বিজয় লাল এই দিক থেকে শিবরামের চেয়ে অনেক ধাপ নীচে বলেই আমাদের মনে হ'য়েছে।

কবি **বিবেকানন্দ** আধুনিক কাব্য জগতে অল্পবিস্তর নাম করেছেন। আজকাল ক্রমে ক্রমে তাঁর কবিতা আদৃত হচ্ছে। তবে এই কথাটা আমাদের মনে হয়েছে যে তাঁর লেখায় কাব্যাংশ খুব বেশী নেই। কিন্তু অধ্যাপক বিনয় সরকার এই কবিকে বেশ একটু উচ্চস্থান দিয়েছেন।

তারপর তরুণের আসরে নাম্‌লেন কবি **প্রেমেন্দ্র মিত্র** তাঁর প্রথম কবিতার বই "প্রথমা"—তিনি বিশ্বের, মানবের এবং এই মাটির অনেক কথাই ব'লেছেন। কিন্তু তাঁর এই বই প'ড়ে আমাদের মনে হ'য়েছে তাঁর কবিতায় যেন 'Whitman'এর বেশ একটু ছাপ প'ড়েছে; তবে তাতে আতঙ্কে শিউরে উঠবার বিশেষ কিছু নেই। কারণ Whitmanকেও আমরা একজন তারুণ্য শক্তির কবি বলেই শ্রদ্ধা করি। আমাদের এই যুবক কবি প্রেমেন্দ্রের লেখায় যদি তেমন একটা রেশ এসে প'ড়ে থাকে তাতে এমন কিছু বিশেষ অন্যায় হয়নি এবং সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে একটা কথা ব'লে রাখা ভাল যে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজে Whitman এর এ ঋণ স্বীকার করেন না; আমাদের কোন বন্ধুকে এক পত্রে তিনি বলেছেন যে, যুগের যে হাওয়া এসেছে তাতে সাগরের এপারের ওপারের লোকের চিন্তাধারা এক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমরাও সে কথা অস্বীকার করিনে।

আমাদের উদীয়মান কবিবন্ধু **অমিয়রতনের** কবিতাতেও তারুণ্যের সুর আছে; তবে সে সুরে হুর্দ্দমনীয়তা নেই। একটা গভীরতা আছে,—সে সুর যেন জাগাতে চায়!

আমরা আজ সংক্ষেপে এবং সহজ ভাবে যে কয়েক জন তারুণ্য শক্তির কবির কথা বল্লাম তা' ছাড়া আরও অনেক তরুণ সাহিত্যিক এই বাংলা দেশে আছেন। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁদের সকলের সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা প্রায় অসম্ভব এবং তা হবে, একঘেয়েমীর নামান্তর। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমরা এই শ্রেণীর কবিদের কাছে থেকে যে নূতন আলো এবং অজানা এক পথের আভাষ পেয়েছি তা আজকালকার তথা-কথিত প্রেমের কাব্য থেকে পাই নাই। এখানে "আজকালকার তথাকথিত প্রেমের কাব্য" বলাতে যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে মনে করেন তবে অবশ্যই তিনি বিশেষ ভুল করবেন; তাতে আর কোন সন্দেহই থাকবেনা। আজকালকার এই বস্তুতান্ত্রিক জগতে (material world) আমরা এমন এক শ্রেণীর সাহিত্য চাই যেটা যোগাবে মানুষের মনের খোরাক এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবে নূতন ধর্ম্মপ্রেরণা। একথা ভুলে গেলে আমাদের মোটেই চলবেনা যে যদিও এটা চণ্ডীদাসের, জয়দেবের দেশ তবুও সে যুগ...সেই বসে বসে প্রেমতত্ত্ব আলোচনার যুগ এ নয়। তাই মনে হয় এই কর্ম্ম যুগে জাতীয় জীবনে প্রাণ দান করবার জন্য এই শ্রেণীর কবিদের বুঝি প্রয়োজন ছিল তাই তাঁরা এসেছেন। সাহিত্য যে মানুষের মনে একটা গভীর রেখাপাত কর্ত্তে সমর্থ হ'য়েছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

আজ আমাদের সভার কাজ আরম্ভ হওয়ার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল সাড়ে চারটে—কিন্তু নানা কারণে দেরী হ'য়ে গিয়েছে; কাজেই আমার বলার বিষয়টায় যথেষ্ট বলবার থাকলেও সংক্ষেপেই শেষ করতে হবে। প্রত্যেক দেশেই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার সম্বন্ধে কিছু ব'লতে হয় না; তবে আমাদের দেশে তার প্রয়োজন আছে। কারণ এখানে এ বিষয়টা এখনও এর গ'ড়ে উঠার ধাপে।

যারা লিখতে প'ড়তে জানে না তারা সাহিত্যেরও কিছু জানে না। আমাদের দেশেও এই অবস্থা একদিন গেছে এবং এখনও চ'লেছে; তবে গান অথবা কবিতা হয়ত' রচনা ক'রেছে; যেমন আমাদের বাউলের গানগুলো—যারা তত্ত্বজ্ঞানে যে কোনও দেশের যে কোনও গানকে পরাজিত ক'রতে পারে।

সাহিত্যের প্রসারতা বাড়াতে গেলে সকলকে লিখন-পঠনক্ষম ক'রে তোলা দরকার। সমগ্র ভারতবর্ষে শতকরা ৮ জন লেখাপড়া জানে। শুধু যদি আমাদের বাঙ্গলা দেশকে ধরা

যায় তবে সংখ্যা একটু বেশী—শতকরা ১১ জন—পুরুষ ৮%, মেয়ে ৩%, এবং দুই মিলিয়ে ১১%র কিছু বেশী। কাজেই আমাদের সাহিত্য যে খুব বড় হ'য়ে উঠবে তা বলা যায় না—তার চেষ্টাও নেই। ১৯২১ সালের আদমসুমারীতে যা' দেখা গিয়েছে এখনও প্রায় তাই আছে দেশের লোকের এবং গভর্ণমেণ্টেরও চেষ্টা থাকলে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে। দু'টো উদাহরণ ও দিচ্ছি :—

(১) আমেরিকার নিগ্রোরা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে। আগে ওখানে নিয়ম ছিল যে যদি কেউ কোন নিগ্রোকে লেখাপড়া শেখায় তবে তাকে সাজা পেতে হবে—সে ক্রিমিন্যালী অফেণ্ডেড্ (Criminally offended),

নিগ্রোরা ছিল আফ্রিকার আদিম অধিবাসী ; তাদের নিজস্ব বর্ণমালা পর্য্যন্ত ছিল না। কিন্তু এখন ত' তাদের স্বকীয় সাহিত্যও র'য়েছে। আমেরিকার ১৯০০ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে দেখা গেছে যে শতকরা ৮৪ জন নিগ্রো লিখতে প'ড়তে পারে—মাত্র ১৬জন এখনও পিছিয়ে র'য়েছে। কিন্তু নিগ্রোদের চাইতে কী আমরা কম বুদ্ধিমান ? আমাদের প্রাচীন সাহিত্যও র'য়েছে : তামিল্ ইত্যাদি। এখনও এক হাজার বছরেরও প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য আমরা দেখতে পাই।

নিগ্রোদের ওপর এখনও অত্যাচার চলে তবু তারা লেখাপড়া জানে এবং গভর্ণমেণ্টও তাদের বহু প্রকারে সাহায্য করে। বুকার জর্জ্জ টি ওয়াসিংটন্ প্রথম তাদের লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করেন। আমরা আমাদের প্রাচীন শিল্প ও সাহিত্য থাকা সত্ত্বেও,মাত্র শতকরা ৮জন শিক্ষিত আর ওরা শতকরা ৮৪ জন শিক্ষিত।

(২) ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় শতকরা ৭৭জন লেখাপড়া জান্তো না। গত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তারা তাদের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কেমন ক'রে সবাইকে শিক্ষিত করা যায় এ বিষয়ে সেই থেকেই তারা সচেষ্ট হ'য়ে ওঠেন। এই ১৫ বছরের চেষ্টায় তাদের অশিক্ষিতের সংখ্যা নেমেছে ৭৭ থেকে ২৬এ।

আপনারা এখন এই প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে এ সবের কী সম্পর্ক র'য়েছে ?—আমি ভাবুক নই, কবিও নই। তবে সহজ ক'রে এই কথাই বলতে পারি যে ভালোভাবে সার দিলে সুফল পাওয়া কিছুমাত্রই অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের এখানে কোন দিনই সে রকম কোন চেষ্টা হয় নি। সেক্সপীয়রের পিতা রেশম পাঁজ ক'রতেন ; স্কট্ল্যাণ্ডের কবি বার্ণস্ নিজে ছিলেন চাষী। কবি কীট্সের পিতা ছিলেন ঘোড়ার সহিস। আমি য়ুরোপে বেড়িয়ে দেখেছি যে আমাদের দেশের সাধারণ লোক ওদেশের সাধারণ লোকের চাইতে কোন অংশেই কম নয়। যেমন সহরের ছেলে ও পাড়া গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। ওদেশের যে বংশে যেমন লোক জন্মেছে—আমাদের দেশেও তেমন হ'তে পারে। তবে হয়নি, কারণ আমরা বুদ্ধিতে শান্ দিই নি।

থিওরি নয়; অনুভব আমরা সবাই-ই করি। আমরা ইজি-চেয়ারে ব'সে আরাম ক'রে দুঃখের কথা বলি। যারা আজীবন দুঃখ সৈয়ে মানুষ হয় তাদের কথা আমরা কল্পনা করেই

বলি। আমাদের কবিতা 'গল্প' উপন্যাস যথেষ্ট আছে। কেম্ব্রিজের জন এণ্ডারসন ব'লেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে মাত্র দুইটি ভাষা আছে ;—বাঙলা এবং ইংরাজী।

যদি মেয়েরা শিক্ষিত হ'য়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে তবে তাদের চোখে দেখা জিনিষ আর আমাদের চোখে দেখা জিনিষ মিলে একটা সম্পূর্ণ সাহিত্য গ'ড়ে উঠবে। মেয়েরাও উচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি ক'রতে পারেন আমাদের প্রাচীন মহিয়সী মহিলাদের নাম করা যেতে পারে। আধুনিক কালেও তিনজন মহিলা (অবশ্য এ দেশের নয়) নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

সাহিত্য সৃষ্টি আমি নিজে করিনি তবে কিছু কিছু বলতে পারি যে, যাঁরা শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সচেতন তাঁরা নিজেদের কল্পনা মত সৃষ্টি করুন সাহিত্য।

এখানে সকলেই আমার চেয়ে ছোট—কাজেই আমি আশীর্ব্বাদ ক'রছি সকলে দীর্ঘায়ু হোক। যাঁদের সাহিত্য প্রতিভা কিছুমাত্র আছে তাঁরা তার সৃষ্টি করুন।

আমাদের দেশের শিক্ষা বিস্তার কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্টের সাহায্য সাপেক্ষ নয়—নিজেদেরও ক'রতে হবে। শিক্ষাবিস্তারের বাধা অতিক্রম করা ও পরাজয় করা সকলের কর্ত্তব্য।*

---

* "আশুতোষ কলেজ সাহিত্য সমিতি"র প্রথম অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতায়—অনিল কুমার চক্রবর্ত্তী অনুলিখিত।

"বুদ্ধাচিন্ত্য-প্রবোধ-প্রেম"—সাহিত্য সম্বন্ধে "বুদ্ধ-ব্যাসিনী" একটি রচনা পাঠাইয়াছেন। স্থানাভাববশতঃ এ সংখ্যায় তাহা ছাপা হইল না ; আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।—সম্পাদক।

"কাব্য-কণা"

পথ যার চ'লতেই হয়—

শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য
(প্রাক্তন ছাত্র)

কোন্ এক অজানা ঝড়ো হাওয়ার দোলা খেয়ে খেয়ালী জেগে ওঠে। সেই উদ্দাম উচ্ছ্বাসের মধ্যে এক অচিন দেশের আহ্বান-সুর ভেসে আসে। খেয়ালী সে সুরে সাড়া দেয়—ক্ষুদ্র গৃহের অন্তরাল থেকে বিশ্বের বুকে সে বেরিয়ে আসে—তা'র পথ চলা সুরু হয়।

পথের শেষ তা'র চোখে পড়ে না। তার ছোট্ট পথটুকু কত গ্রামের, কত বনের, কত মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে গিয়ে কোন্ সুদূর সীমান্তে শেষ হয়েছে কে জানে? সেই পথের উপর উদ্দাম পা ফেলে খেয়ালী ছুটে চলেছে। কে বলতে পারে তার এই পথ চলার শেষ কোথায়?

পথের দুপাশে ফুল ফুটে ওঠে—ঝরে পড়ে। খেয়ালীর সে দিকে লক্ষ্য নেই। তা'র দৃষ্টি চেয়ে আছে সেই দিকে যেখানে সবুজ পৃথিবী অনন্ত নীলিমার সঙ্গে মিশে গেছে। তার পথিক বন্ধুরা ফুল নিতে ছুটে যায়—বলে, আস্‌ছি। কিন্তু সে আসা আর তাদের হয়ে ওঠে না। খেয়ালী ফিরে দেখে—তারা নিজেদের গড়া ফুলের মালায় জড়িয়ে পড়েছে—সে শিকল ছেঁড়বার ক্ষমতা তাদের নেই।

খেয়ালীর ভয় লাগে পাছে সেও অমনি করে ভেঙ্গে পড়ে কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য, তার পরেই আবার তা'র নিরুদ্দেশ পথের যাত্রা সুরু হয়।

এমনি করে ধীরে ধীরে তার জীবন শেষ হয়ে আসে—শ্রান্ত দেহখানি মাটীর উপর লুটিয়ে পড়ে, পৃথিবীর বিদায় গীতি তার বুকের বীণার তারে বিষাদ সুর ফুটিয়ে তুলে। অস্ত সূর্য্যের রঙ্গীন আলোর সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের ক্ষুদ্র দীপশিখাও অনন্ত আকাশে আপনার জ্যোতিটুকু মিলিয়ে দেয়। মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে—তাকে অন্য পৃথিবীতে নিয়ে যায়।

জীবনের শেষ দিনে তার মুখের কোণে হাসির রেখা লেখা দিয়েছিল কিম্বা তা'র ক্ষুব্ধ অন্তরাত্মার অনুশোচনার দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবী বেদনায় ভরে উঠেছিল কিনা কে জানে?

মহেশচন্দ্র

অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

এমন একদিন গিয়াছে, যখন অধ্যাপক মহেশচন্দ্র এই কলেজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁর কথায় ছেলেরা উঠিত, বসিত। সেই কৃশদেহ, ঋজুদণ্ড, সৌম্য-সুন্দর, স্মিতানন ব্রাহ্মণোত্তম কলেজের সমস্ত কাজে পুরোধাস্বরূপ ছিলেন। আশুতোষ বা সাউথ সুবারবান কলেজ বলিলে "Prof. M. C. Chatterjee"কেই বুঝাইত।

অধ্যাপক মহেশচন্দ্র যথার্থ শিক্ষক ছিলেন। আজ তাঁহার দেহান্তে অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমি নানারকমে মিশিয়াছি, উভয়ের মধ্যে সহযোগীত্ব লুপ্ত হইয়া ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছিল। ১৯২৩ সালে যখন প্রেসিডেন্সী ও মেদিনীপুর কলেজের কাজ শেষ করিয়া এখানে আসি, তখন প্রথমই চোখে পড়িল এই সাহেবটীকে। আচারে, ব্যবহারে, কথায়, হাসিতে, খানাপিনায় ইনি একেবারেই খাস বিলাতী। কিছুদিন পরে তাঁহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। 'পরধন-লোভে মত্ত' এই Sybarite বা ভাববিলাসী একেবারে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। তাঁর বাড়ী গিয়া দেখি, তিনি সান্যাল মহাশয়ের দীক্ষামন্ত্রে নবজন্ম লাভ করিয়াছেন। সে হিসাবে আমরা ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে 'ত্রিজ' বলিতাম। তিনি উত্তরপাড়ায় রানঘাটে ভাগীরথীর তীরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছিলেন। প্রভাতে সন্ধ্যায় দেবতার পূজায় তাঁহার সমস্ত সময় ব্যয় হইত। তাঁর সুপ্রশস্ত ত্রিপুণ্ড্রক-লাঞ্ছন ললাট, মস্তকে শিখাগুচ্ছ, সর্ব্বদেহ চন্দনগন্ধে ভরপুর। তাঁর বাক্যের ভঙ্গী পুরুষোচিত ও সুদৃঢ়। তাঁর প্রশস্ত আনন যেন ধ্যানমৌন হিমাচল অস্তগামী সূর্য্যের গলিতবর্ণরাগে অনুরঞ্জিত। তাঁর চক্ষের জ্যোতি তীক্ষ্ণ,—যেন তুর্কী সৈন্যের শাণিত কৃপাণ। তাঁর মন্থরগতি,—ভাবনিভোর, শান্ত অথচ শক্তিব্যঞ্জক। এমন লোক সহজে দেখা যায় না।

দীক্ষার পূর্ব্বে তাঁহার লক্ষ্যহীন জীবনের কথা বলিলে তিনি হাসিতেন। ভয় হইতে তিনি অভয়ে আসিয়াছিলেন,—বাইবেলের ভাষায় তাঁহার বালুকার বনি-য়াদের স্থলে প্রস্তরের বনিয়াদ হইয়াছিল,—গত জীবনের পানে তিনি আর ফিরিয়া চান নাই। হিন্দুধর্ম্মের অলৌকিকত্বে তাঁর অগাধ বিশ্বাস হইয়াছিল,—তাই তিনি

এক আসন্নমৃত্যু নারীকে পদধূলি প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে মৃত্যু তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। কাল রোগ যখন তাঁহার দেহ শীর্ণ করিয়া দিতেছিল, ধর্ম্মবিশ্বাসী মহেশচন্দ্র তখন বলিতেন যে তাঁর পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। শুনিয়াছি, সুদূর প্রবাসে মরণোন্মুখ হইয়াও তিনি সযত্নে বিশ্বদেবতার পূজা করিতেন। কোন এক বিখ্যাত মহারাজকুমারের শিক্ষক হইয়া বিলাত যাইবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ লইয়া তিনি একদিন আমাদের বাটীতে আসেন। আমি যাইতে সম্মত না হওয়ায় তিনি শেষে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁর সেক্সপীয়র আবৃত্তি অনবদ্য ও অপূর্ব্ব ছিল। কিন্তু তিনি আত্মপ্রকাশ করিতে জানিতেন না। লক্ষ্ণৌ রীতি বজায় রাখিয়া তিনি অনর্গল উর্দ্দু ও হিন্দীতে যে বক্তৃতা দিতেন, তাহাও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সমগ্র জগতের অনেক খবর তিনি রাখিতেন এবং তাঁর মেধাশক্তি বিস্ময়কর ছিল। গঠনমূলক কার্য্যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন; ব্যক্তিত্বের প্রসার ও ক্ষমতায় তাঁর মত লোক খুব কমই দেখিয়াছি।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল নানাভাবে তাঁর সঙ্গে মিশিয়াছি। একবার অজ্ঞাতসারে তিনি আমার অত্যন্ত ক্ষতি করায় তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া পত্র লিখি। তিনি ছুটিয়া আসিয়া আমার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করেন। তখন ব্যাপারটা বুঝিয়া আমি তাঁর কাছে আমার সশ্রদ্ধ প্রীতি নিবেদন করি,—তখন আমার মনের কুহেলিকা দূর হইয়া যায়। তাঁর উত্তরপাড়ার বাড়ীতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ হইত। এই বন্ধুবৎসল সন্ন্যাসধর্ম্মী গোপনে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া জানিয়া যাইতেন কোন্ খাদ্য আমার সমধিক প্রিয়। আজ তাঁহার তিরোধানে অনেক ছোটখাটো কথা মনে পড়িতেছে; তাই তাঁর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিব না।

'চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে'র জন্য মহাত্মা গান্ধী যখন দীর্ঘকাল কলিকাতায় অবস্থান করিয়া অর্থভিক্ষা করিতেছিলেন, তখন মহেশবাবু ও আমি প্রায়ই মহাত্মাজীর নিকট যাইতাম। মহেশবাবু নিজের চেষ্টায় এই কলেজ হইতে অনেক টাকা তুলিয়া প্রকাশ্য সভা করিয়া মহাত্মাজীর হস্তে সমর্পণ করেন। সেই সূত্রে তিনি যে অপ্রস্তুত বক্তৃতা করেন তাহা শুনিয়া মহাত্মাজী বিস্মিত হন। তাঁহার জিহ্বামূলীয় দেবতা তাঁহাকে অদ্ভুতকর্ম্মা করিয়া তুলিয়াছিল। সমস্ত কার্য্যে তাঁহার এমনি একটা সুন্দর পারিপাট্য ছিল যে তাহা একবার দেখিলে ভোলা যাইত না।

যৌবনের প্রারম্ভে তিনি লক্ষ্ণৌএর সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও গায়ক অতুলপ্রসাদের

প্রিয় শিষ্য ছিলেন। মধ্যযৌবনে তিনি প্রকৃষ্ট হিন্দু হইয়া নিজের শিক্ষিতা স্ত্রীকেও সহধর্ম্মিণী করিয়া তুলেন। আজ তাঁর অনাবিল হাস্যের স্বচ্ছন্দ-ধারা আমার কাণে আসিয়া বাজিতেছে। আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি,—সেই কালো আলপাকার চোগা-চাপকান্-পরিহিত শিখাধারী পুরুষ একখানি বাইবেল ও সেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' হস্তে লইয়া 'রুম নম্বর 'ওয়ানে'র দিকে মন্থরচরণে চলিতেছেন, তাঁর হস্তে একটী রাঙ্গা পেন্সিল, মুখে চোখে একটু কৌতুকময় হাসি, উদার ললাটে নিবিড় প্রশান্তি,—যেন ধ্যানমগ্ন মহেশ গিরিগাত্রে সহসা গিরিজার ছায়াপাত দেখিতে পাইয়াছেন। শুনিতে পাইতেছি তাঁর বজ্রোদাত্ত কণ্ঠ, পুরীর বেলাভূমে যেন বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস। দেখিতেছি তাঁর দৃঢ়সংযুক্ত মুষ্টি, তর্কের সময় তিনি যে কঠোর যুক্তি অমোঘভাবে প্রয়োগ করিতেন, তারই ব্যঞ্জনা। লঘু চিন্তা তাঁর মনে সহজে স্থান পাইত না বটে, কিন্তু আবাল্য সাহেবী স্কুলে পড়িয়া তাঁহার মনে যে 'খেলো-য়াড়ে'র ভাব বিকশিত হইয়াছিল, তাহারই গুণে তিনি সকলের সঙ্গেই কৌতুক করিতে পারিতেন।

মৃত্যু আমাদের অমৃতের দেশে লইয়া যায়ঃ আজ তাঁর কণ্ঠ নীরব হইয়াছে, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, আজ তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁর কোমলবয়স্কা স্ত্রী ও শিশুগণ তাঁর অভাব সারা জীবন ধরিয়া অনুভব করিবে, কিন্তু আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তিনি যে দেবতার সান্নিধ্যলাভ করিবার জন্য সারাজীবন নির্ব্বাকভাবে দারিদ্র্যের ও অভাবের সঙ্গে যুঝিয়াছিলেন, আজ সেই যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। আজ তাঁর চির-বাঞ্ছিত পুষ্পমালা হস্তে ত্রিদিব তোরণে এই বিজয়ী-বীরকে সংবর্দ্ধনা করিয়া লইতেছেন। দারুণ শ্রান্তির পর তিনি বহু-প্রার্থিত বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার আত্মা চিরনির্বৃতি লাভ করুক।

নাছোড়বান্দা

অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল

কুশীলব

বড় বাবু — নরেন বাবু

শান্তিরাম

[অফিসে বড় বাবুর ঘর। বড়বাবু মোটা সোটা—ঠিক যেন গোবরগণেশ—বসে আছেন আপনার চেয়ারে—অর্থাৎ চেয়ারটার হুটো হাতলই ভরা—সামনে স্তূপাকার কাগজ-পত্তর পড়ে আছে কালী-মাখা টেবিলের উপর—বড়বাবু নাকের ডগায় চশ্‌মা লাগিয়ে একটা একটা করে' কাগজ দেখ্‌ছেন—মাঝে মাঝে নাক মুখ সিঁট্‌কাচ্ছেন—কাট্‌ছেন, ছাঁট্‌ছেন—সই দিচ্ছেন—এই সব।

হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল গেল—কলিং বেলটা টিপ্‌লেন। কলিং বেল বেজে উঠ্‌লো। দরজা খুলে ঢুক্‌লো অফিসের পুরানো বেহারা শান্তিরাম।]

বড়বাবু—শান্তিরাম, এদি?

শান্তি—হাঁ, হুজুর।

বড়বাবু—ওরে, নরেন বাবু অফিসে এসেছে কিনা, জানিস্?

শান্তি—হাঁ, হুজুর।

বড়বাবু—(স্তম্ভিত) নরেন বাবু রে, নরেন বাবু—অফিসে এসেছেন বাবু?

শান্তি—হাঁ, হুজুর।

বড়বাবু—বুঝে সুঝে জবাব দে। আমি তোকে বল্‌ছি—পাট ডিপার্টের টাইপ বাবু—নরেন বাবু যাঁর নাম—তিনি তাঁর জায়গায় বসে আছেন কি না। বল্—হাঁ কি না।

শান্তি—হাঁ, হুজুর, তিনি তাঁর জায়গায় বসে আছেন—কাজ কচ্ছেন।

বড়বাবু—(সন্দিগ্ধ স্বরে) শান্তিরাম, বাবা, গাঁজায় দম দিয়েছ কি?

শান্তি—(হতাশভাবে) কে? আমি?

বড়বাবু—বাবা, একবার ভুলেও সত্যি কথাটা বল্ দেখি। আমি তোকে কিছু বল্‌বো না।

শান্তি—(কান্নার স্বরে) হুজুর, আমার বাপের জন্মে ওসব করি নি।

বড়বাবু—(স্বগত) নরেন বাবুর অফিসে আসা—এযে বিশ্বাস করা যায় না—আশ্চর্য্য ব্যাপার! তিনি তো ডুব মেরেই থাকেন।...যাক্, তাঁকে আমি দেখ্‌তে চাই। যা, তাঁকে তলব দে।

শান্তি—আচ্ছা, হুজুর।

[বেহারা চলে গেল। বড়বাবু কাগজ পত্তর ঘাঁট্‌তে লাগলেন। দরজায় টোকা পড়লো।]

বড়বাবু—আসুন!

[নরেন বাবু প্রবেশ করে আভূমি প্রণাম করলেন।]

নরেন—বড়বাবু !

বড়বাবু—(রাশীকৃত কাগজের স্তূপের ভিতর থেকে) আসুন, নরেন বাবু। বসতে আজ্ঞা হয়

নরেন—কী বলছেন, বড়বাবু ?

বড়বাবু—নাঃ, এমন কিছু নয়! আচ্ছা, নরেন বাবু, ব্যাপার কি মশায়? আজ দিন পনেরো হোল মশায় তো আফিসের দিকে পা বাড়ান না।

নরেন—(বিনীতভাবে) অমন করে' আমায় লজ্জা দিবেন না !

বড়বাবু—আমার যা' বলবার, বলতে দিন, মশাই। এই কথা বলবার জন্যেই ঠাকুরকে আমার ঘরে ডেকেছি। বলছি কি, প্রায় দিন পনেরো হোল আপনি আফিসে আসছেন না—ছুটির দরখাস্তও নেই—ব্যাপার কি ? আপনি আসছেন না শুনে' ভাবলাম হয়তো অসুখ করেছে—তাই খোঁজ নিতে দু' দু'বার ডাক্তার বাবুকে পাঠিয়েছি আপনার বাড়ীতে। আর দু'বারই তাঁকে বলা হয়েছে, আপনি মদের দোকানে গেছেন।

নরেন—বড়বাবু, আমার চাকরটা মিথ্যে কথা বলেছে। জানি, বেটা হাড়-মিথ্যুক।

বড়বাবু—অতো চটে উঠবেন না, নরেন বাবু।

নরেন—বড়বাবু, ব্যাপারটা তা'হলে বলি। বিশেষ কোনো সাংসারিক ব্যাপারে বাইরে যেতে হয়েছিল।...বড়বাবু আমার ভগ্নীপতিটি মারা গেছেন......

বড়বাবু—একই ওজর কতবার খাটবে, নরেন বাবু ?

নরেন—বড়বাবু......

বড়বাবু—থাক, নরেন বাবু, আমার কাছে চালাকী চলবে না !

নরেন—চালাকী কচ্ছি ? আমি ?

বড়বাবু—তা' নয় তো কি ? এবার আপনার ভগ্নীপতি ম'লেন, তিন হপ্তা আপনার খুড়ী মরেছে, গত মাসে মরেছে আপনার খুড়ো, তার আগের মাসে বাবা, আর তার আগের মাসে মা।—বলি, এখনো বেঁচে আছে, এমন কটি আত্মীয় আপনার আছে, শুনতে পাই কি ? আহা ! কী দুঃখ,—এ দস্তুরমতো হত্যাকাণ্ড ! এ কি ভাবা যায় ?...অবশ্য বোনের বিয়ে—সেতো বছরে দু'বার আছেই—তার কথা নয় বাদ দিলাম। তারপর পরিবারের অসুখ, ছেলের অসুখ, মেয়ের অসুখ, সে নয় ধরি না। কিন্তু অনেক হয়েছে—আর নয়—একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছি। সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে। আপনি যদি মনে করেন, মাসে মাসে কোম্পানী আপনার গুনছে পঞ্চাশ টাকা করে'—আপনি কার বিয়ে দিতে যাচ্ছেন, কাকে পোড়াতে যাচ্ছেন, কার শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ রাখতে যাচ্ছেন এই জন্যে—তাহলে আমার বাধ্য হয়ে বলতে হবে, আপনি বেজায় ভুল করছেন।

নরেন—বড়বাবু—

বড়বাবু—একটু থামুন। আমার বলা শেষ হোক—তারপর বলবেন। পাট ডিপার্টে মোট তিন জন বাবু—আপনি, হরি বাবু আর জীবন বাবু। হরিবাবুর চাকরী হোল আজ ৩৫ বছর—তাঁকে তো ছাড়ানো যায় না—তিনি যা' করেন সয়ে যেতে হয়। জীবন বাবুর কথা যদি বলেন—তিনি বাইরে বেচাকেনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন—তাঁর আফিসে

আসা না-আসা—সে সব কৈ ফিয়ৎ সাহেবের কাছ। এখন দেখুন, আফিসের কি অবস্থা। তিনটি বাবু—একজন অথর্ব, চেয়ারে বসে' চল্লিশ ঘণ্টা আফিংএর ঝোঁকে ঝিমুন—কোনো রকমে দু'কুড়ি সাতের খেলাটাও করতে পারেন না—সেই ম্যাকেঞ্জি সাহেবের আমলের লোক—কিছু বলতে গেলে কাতুনী গান। আর একটি চকীর মতো ঘোরেন আর রিপোর্ট দিয়েই খালাস পান। বাকী রইলেন আপনি—তা' আপনি তো সারা বছর মড়া পোড়াইতে ব্যস্ত —এতে কি আর কাজ চলতে পারে? পারে তো নাই।—আমি অনেক সয়েছি—আপনার ওসব চুতো,—মাতৃদায়, পিতৃদায়, অমুকের বিয়ে, অমুকের শ্রাদ্ধ, অমুকের ছেলের ভাত, পৈতে,—এসব আর পারি না। আমি আপনাকে দুটো পথ বাতলে দিচ্ছি—হয়, আজ থেকে রোজ নিয়মিত আফিসে আসবেন, যদি চাকরী রাখতে চান, আর নয় ভালোয় ভালোয় পাততাড়ি গুটুন। বেছে নিন্—কি করবেন। যদি ইস্তফা দিতে চান—বেশ, আমি তা মঞ্জুর করবো। বুঝতে পার্লেন? আর যদি তা' না দিতে চান, তাহলে রোজ সকাল দশটা সন্ধ্যে ছ'টা পর্য্যন্ত আফিস করে' আমার পিতৃ-পুরুষের সদ্গতি করুন (দেয়ালের দিকে) এ যেন আমার বাপ-মা-মরা দায় হয়েছে—সত্যি?—বোধগম্য হোল, নরেন বাবু? আর দেখুন, ভবিষ্যতে যদি আপনার পারিবারিক কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহ'লে সেই মুহূর্ত্তে আপনাকে পথ দেখতে হবে। বুঝলেন?

নরেন—প্রাণে বড় ব্যথা দিলেন, বড়বাবু। আপনার কথার ভাবে বুঝতে পাচ্ছি, আপনি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

বড়বাবু—সে যাক্। আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি আপনার উপর খুব খুসী হয়েছি।

নরেন—ঠাট্টা কর্ছেন, বড়বাবু?

বড়বাবু—ঠাট্টা? আমি? আপনাকে? আমাকে কি মনে করেন? অমন কুবুদ্ধি আমার কি হতে পারে?

নরেন—নিশ্চয়ই আপনি ঠাট্টা কর্ছেন। যে-সব অজগুর আমাকে দেখলেই ঠাট্টা করে, আমায় যা' তা' বলে, আপনিও কি তাদের দলে গেলেন?...লোকের উপহাস কুড়িয়েই আমার সারা জীবন গেল।

বড়বাবু—(বিস্মিত হ'য়ে) কী বলছেন আপনি?

নরেন—শুনুন, বড়বাবু। গরীব কেরানী—আফিসে আসে না, আসতে চায় না—তার কারণ এলেই দরজার কাছে তাকে নিয়ে যা' তা' করা হয়, ঠাট্টা করে' তাকে নাস্তানাবুদ করা হয়—সেই ভয়ে। তাই দিন দিন তার দেহ মন জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এদিক দিয়ে আমার কথাটা কি কোনোদিন ভেবেছেন?

বড়বাবু—না।

নরেন—তাতো হবেই। আমার জীবন দুর্ব্বিষহ। রোজ সকালে নিজের মনে বলি, "নরেন, আফিসে যেতে হবে—আট দিন যাও নি," চারটি ভাত গুঁজে, কোটটা গায় গলিয়ে বেরিয়ে পড়ি; পা দু'টোকে আফিসের দিকে টেনে আনি। পথে শুঁড়িখানা; সুড় সুড় করে পা দু'টো তারির ভেতর চলে যায়। এক গ্লাস টানি—দু' গ্লাস—তারপর তিন গ্লাস।

নরেন—(বিস্মিত) ইস্তফা ? আমি তো ওকথা ভাবি নি, বড়বাবু। আমি শুধু মাইনে বাড়ানোর জন্তে আবেদন করছি ?

বড়বাবু—সে কি ? মাইনে বাড়ানো ? সে কি ?

নরেন—(যেতে যেতে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে) মাইনে বাড়া উচিত নয় কি, বড়বাবু ? মাসে পঞ্চাশ টাকার জন্তে তো প্রাণ দিতে পারি না।

যবনিকা।

অবেলায়

অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল

ফুলের বেলা সাঙ্গ এবার
        ভাঙ্‌রে আসর এইখানে।
কাঁটার পালা হচ্ছে সুরু
        গাইবি রে তুই কোন্ প্রাণে ?

ফুরিয়ে গেছে বাসর রাতি
বৃথাই কেন জ্বালাস্ বাতি,
শুক্‌নো ফুলে শয়ন পাতি'
        থাকিস্ বসে' কার টানে ?

ভাঙন-ধরা হৃদয়-কূলে
খেয়ার তরী লাগ্‌বে ভুলে,
কাঁটার রশি ভর্‌বে ফুলে,
        মন বুঝি তোর তাই জানে।
খোঁজার বেলা পেরিয়ে দিয়ে
        ফিরিস্ মিছে সন্ধানে।

---

(১)

রেফ ও মহাত্মা লোক।

অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ, উষ্টসাগর।

যখন কোন মহাত্মা লোক অন্য কোন মহাত্মা লোকের আশ্রয়ে গমন করেন, তখন শেষোক্ত মহাত্মা পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাকে মাথায় তুলিয়া রাখেন। যখন শেষোক্ত মহাত্মা পূর্ব্বোক্ত মহাত্মার আশ্রয়ে যান, তখন পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাও শেষোক্ত মহাত্মাকে শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়া দেন। রেফের সহিত মহাত্মা লোকের তুলনা করিয়া কোন স্ত্রী-কবি এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন :—

যাতঃ পরেণ স্বশিরে বিধার্য্যতে
য আগতে সদ্ম নিজং নতঃ স হি।
প্রায়ঃ পরস্য দ্বিগুণস্বমীহতে
রেফেণ তুল্যো হি মহাত্মপূরুষঃ॥
(বিকটনিতম্বায়াঃ) (১)

রেফ গিয়া যে বর্ণের আশ্রয় লইবে,
অমনি সে বর্ণ তারে মাথায় রাখিবে।
রেফের আশ্রয়ে তথা যে বর্ণ আসিবে,
রেফ নীচে থাকি তারে মাথায় তুলিবে।
যখনি বসিবে রেফ মাথায় যাহার,
দ্বিগুণ করিবে প্রায় অবস্থা তাহার।
তাই বলি, এ সংসারে মহাত্মা যে জন,
তাঁহার অবস্থা হয় রেফের মতন!

---

(১) মহারাজ বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের বাটীতে দুইটী রমণী (যোগানী) ছিলেন। এক জনের নাম বিকটনিতম্বা ও আর এক জনের নাম বিবিচনিতম্বা। শুনিতে পাওয়া যায়, ইহারা দুই সহোদরা এবং দুই জনেই সুকবি ছিলেন। ইহাঁদের রচিত কয়েকটী মাত্র উদ্ভট-কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।—লেখক।

ছাত্র-শিক্ষা

অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি.এ, উদ্ভটসাগর।

কিরূপ ছাত্রকে শিক্ষকের শিক্ষাদান করা উচিত বা অনুচিত তাহাই একটি প্রসিদ্ধ স্ত্রী-কবি এই শ্লোকে নির্ণয় করিয়াছেন :—

যশ্ছাত্রঃ শ্রুতমাত্রমর্থমখিলং গৃহ্ণাতি স শ্রাব্যতাং
যো বেত্তি দ্বিরুদাহৃতং কৃতফলং তত্রাপি বক্তুর্ব্বচঃ।
যস্তু স্পষ্টমনেকশোঽপ্যভিহিতং নাবৈতি লেখার্পিতাং
ধিক্ তং তৎপিতরৌ ধিগেব নিতরাং ধিক্ তদ্‌গুরুং গর্দ্দভম্ ॥

(হটী বিদ্যালঙ্কারস্য) (১)

যে ছাত্র শুনিবা মাত্র অর্থ বুঝে মনে,
তাহারেই শিক্ষা দিবে বিশেষ যতনে।
যে ছাত্র দু-বার শুনি' অর্থ বুঝে লয়,
তাহাকেও শিক্ষা দেওয়া উচিত নিশ্চয়।
বারংবার স্পষ্ট স্পষ্ট ক'রেও শ্রবণ
যে ছাত্র প্রকৃত অর্থ না বুঝে কখন,
ধিক্ সেই ছাত্র, ধিক্ মাতাপিতা তার,
আর শত ধিক্ তার গর্দ্দভ মাষ্টার।

---

(১) "হটী বিদ্যালঙ্কার" নাম শুনিলেই মনে হয়, ইনি পুরুষ, কিন্তু তাহা নহে। ইনি স্ত্রীলোক। বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত কলাইঝুটী গ্রামে নারায়ণদাস নামক একজন রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হটী তাঁহারই কন্যা। ইঁহার প্রকৃত নাম "রূপমঞ্জরী"। তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী এক সংস্কৃত-চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে দেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে তিনি অসাধারণ বৈয়াকরণ হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি মাতাপিতৃহীন হইয়াও ৺কাশীধামে গমন করিয়া কাব্য ও বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যলাভ করেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি আজীবন অনূঢ়া থাকিয়াও স্বীয় চরিত্র নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পুরুষের ন্যায় বেশভূষা করিতেন এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া শিখা রাখিতেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, ২৭ ডিসেম্বর, বুধবার তিনি দেহত্যাগ করেন। কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ১৮২২ খৃষ্টাব্দে "সমাচার দর্পণ" ও "ফ্রেণ্ড-অফ্-ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদ-পত্রে হটী বিদ্যালঙ্কারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।—লেখক

চিঠি-পত্র

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

বিগত ২রা মার্চ্চ শুক্রবার আমাদের কলেজে সাহিত্য সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়েছিলো। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মাল্যদান ও যথাবিহিতরূপে সভাপতি বরণের পর সমিতির কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীপ্রফুল্ল সরকার "অনুভূতি ও সাহিত্য"নামে একটী সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তারপরে শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় "রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ ও চণ্ডালিকা" সম্বন্ধে একটী সুন্দর আলোচনা পড়েন। বন্ধুবর অনিল চক্রবর্ত্তী তারপরে 'ক্রমশঃর পরে' ও আমাদের নিয়ে গিয়ে গল্প শোনান।

বলা বাহুল্য উপরিউক্ত তিনজনের রচনাই তাঁদের ক্ষমতার উপযুক্ত হয়েছিলো। এর পর সভাপতি মহাশয় "সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার সারাংশ অন্যত্র প্রকাশিত হোল।

মোটের ওপর অনুষ্ঠানটী যে সাফল্যমণ্ডিত হ'য়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই। যাঁরা আমাদের এই অধিবেশনটীকে সার্থক করবার জন্যে সহানুভূতিপূর্ণ সাহায্য অযাচিতভাবে করেছিলেন—তাঁদের এই সুযোগে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে তাঁদের কাছে আরো বেশী আমরা আশা করি।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে একমাত্র দর্শনের সুযোগ্য অধ্যাপক ছাত্রদের বন্ধু মিষ্টভাষী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেছেন। তাঁর কাছ থেকে সেদিন আমরা যা' পেয়েছিলুম তা' আশাতীত। তবে সেজন্যে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ অথবা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধৃষ্টতা কোরে তাঁর মানের অমর্য্যাদা করবো না। এ ছাড়া শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ঘোষালের কাছে আমরা যতটা পাবো আশা করেছিলুম তা' পাইনি—বোধ হয় তিনি অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন—যাই হোক আমরা পরের অধিবেশনে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পেতে চাই ত।

অন্যান্য অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও তাঁরা আমাদের নিরাশ করেছেন। তাঁদের এরকম নিরাশ করবার কারণ বুঝে উঠ্‌তে আমরা অপারগ, তবে যদি অজ্ঞাতভাবে তাঁদের কাছে আমরা দোষ করে থাকি আশা করি স্বাভাবিক ঔদার্য্যের গুণে তাঁরা স্নেহের চোখে দেখে আমাদের মার্জ্জনা করবেন। সকল ছাত্রদের কাছ থেকে আমরা আশাতিরিক্ত সহানুভূতি পেয়েছি। এই অনুষ্ঠানটী যে শুধু তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের নয় পরন্তু সমগ্র কলেজের এটা তাঁরা বুঝে উঠতে পেরেছেন বলে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ষ্টুডেন্টস্ য়ুনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীসুকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার।

এতবড় একটী বিরাট অনুষ্ঠানকে যে ছাত্রীরা আপনাদের বলে ধরে নিতে পারেন নি

কেন—তার কারণ বুঝে উঠ্‌তে আমরা অক্ষম। যে দুইজন সহৃদয়া ছাত্রী সেদিন উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সুযোগে। বাস্তবিক অসহযোগীতার কোনোও কারণ এর মধ্যে থাকা সম্ভবপর নয়।

শ্রীতারিণী মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক সাহিত্য-সমিতি

বন্ধু!

আজ তোমাদের কাছে এই চিঠির ভেতর দিয়ে উপস্থিত হ'তে হচ্ছে। কোন অনিবার্য্য কারণে আমি এই স্থান ত্যাগ ক'রে যে'তে বাধ্য হ'চ্ছি। পৃথিবীতে কোন স্থানে কোন জিনিষের স্থিতি বেশী দিনের জন্য নয়, সেই বিধানানুযায়ী আমাকেও আজ এই স্থান ত্যাগ ক'রতে হচ্ছে।

যখন 'কলেজে' "ইণ্টারমিডিয়েট" পড়বার জন্য প্রবেশ করি তখন মনে অনেক আশা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছিলাম। আজও সেই ভাব নিয়েই অন্য পথের যাত্রী হয়েছি, জানিনা কতদূর সফলতা লাভ করতে সক্ষম হব।

তোমরা আমাকে যতটা ভালবাসা দিয়েছ, আমি তার কোন প্রতিদান দিতে পারি নাই। তোমরা আমায় "কমন্ রুমের" সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করে যে কতটা ভালবাসার নিদর্শন দেখিয়েছ, কিন্তু নেহাৎ অকর্মণ্য আমি কোন কাজ সুসম্পন্ন করবার আগেই তোমাদের দেওয়া পদ ত্যাগ ক'রে,সেই পদের অমর্য্যাদা দেখিয়ে কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বানে ছাত্রজীবন ত্যাগ করে' কর্ম্ম জীবনে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছি সে জন্যে আমি আজ আমার বন্ধুদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি তোমরা তোমাদের নিজগুণে আমায় ক্ষমা ক'রবে ও সেই পদে উপযুক্ত বন্ধুকে নিযুক্ত ক'রে, আমার ত্রুটী সংশোধন ক'রে 'কমন্ রুমে'র শ্রীবৃদ্ধি করতে চেষ্টা ক'রবে। অল্প কিছুদিনের জন্য তোমাদের সঙ্গ পেয়েছিলাম সেই স্মৃতি আমার জীবন-পঞ্জিকাতে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। অসময়ে বিশেষ কা'রেও না জানিয়ে চলে যাচ্ছি, বোধ হয় আমার কথা মনে ক'রে আমার বন্ধুরা আমায় কোন দোষে দোষী করবে না।

'কলেজের' ও তোমাদের মায়া ত্যাগ ক'রে যে'তে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তোমরা আমায় ক্ষমা করেছ ভেবেই, সেই কষ্টের মধ্যেও অনেকটা আনন্দ পাচ্ছি। কর্ম্মময় জীবন—সময় অতি অল্প—বিদায়—বন্ধু, বিদায়.....

শ্রীকুমুদচন্দ্র সেনগুপ্ত
(কমনরুম সেক্রেটারী)

শ্রীপরিতোষ গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীপরিতোষ গঙ্গোপাধ্যায় বিখ্যাত ব্যায়ামবীর শ্রীযুক্ত বিজয় মল্লিক মহাশয়ের অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র।

পরিতোষ মাত্র আঠারো বছর আগে এই পৃথিবীতে এসেছেন এবং এই এত অল্প বয়সে তিনি এমন সুন্দর শরীর গঠন ক'রেছেন যে তা' যে কোন বাঙালী ছেলের ঈর্ষা উৎপাদন ক'রবে।

তিনি পেশী-সঞ্চালনে (musele controlling) চমৎকার কৃতিত্ব অর্জ্জন ক'রেছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে Musele controlling competition for Calcutta Championship-এ তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তারপর কলিকাতা "এভার-রেডি ক্লাবে"র বার্ষিক অধিবেশনে তিনি তাঁর অদ্ভুত পেশী-সঞ্চালন দেখিয়ে উপস্থিত সকলকে চমৎকৃত করেন। সবাই উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করেন এবং তাঁহাকে একখানি স্বর্ণ-পদক উপহার দেন।

তিনি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়ে ব্যায়াম ক'রতে আরম্ভ করেন। সাধারণতঃ তিনি "বার-বেল্" নিয়ে ব্যায়াম করেন—"চিত্তনে"র প্রণালীতে। ইনি সাঁতার, ফুটবল ইত্যাদিতেও বেশ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

আমরা এই যুবকের দীর্ঘ জীবনে পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

সম্পাদক।

সম্পাদকীয়

—:০:—

নূতন বর্ষের আলোক-উজ্জ্বল প্রভাতে আমাদের সাদর-সুন্দর অভ্যর্থনা ও নমস্কার রাখিলাম—প্রিয়ের জন্য, অন্তরের আত্মীয়ের জন্য।

পুরাতন চিরদিনই পুরাতন : নূতনকে সে প্রতি পলে পলে তাহার ক্রোড়ে টানিয়া লইতেছে। অতীতের অন্ধকারে বর্ত্তমানের নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তি ঘটিতেছে—কেবল "উদাসীন স্মৃতি আশার সমাধি'পরে বসিয়া" গুমরিয়া মরিতেছে। একটির পর একটি করিয়া যবনিকা মহাকালের রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া যাইতেছে। কতক নট অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে আর কতক নূতন করিয়া অভিনয় সুরু করিবে বলিয়া তৈয়ারী হয়। যাহারা ক্লান্ত, অবসাদ-আক্রা তাহারাও নূতন আলো পাইবার আশায় সব ভুলিয়া যায়। এমনি করিয়া অন্ধকারকে বিস্মৃত হইতে পারে বলিয়াই মানুষ আজও চলিতেছে—পৃথিবী চলিতেছে। মুসাফির-জীবনে দেনা-পাওনা তো অতি ক্ষণিকের ; চলিবার পথে কবে কোন্ পান্থশালায় কী ফেলিয়া যাইব কেহ খুঁজিবেও না। কিন্তু এই যে নূতনকে বরণ করিয়া লইবার আনন্দ ইহাই বুকের ছিন্ন ঝুলিতে অক্ষয় হইয়া থাকিবে—পথের পাথের আমাদের!

"নূতন গানে নূতন রাগে
নূতন ক'রে হৃদয় জাগে
সুরের পথে কোথা যে যাই
না পাই সে উদ্দেশ।"

রবীন্দ্রনাথ।

* * *

আমাদের কলেজে এবার অনেক কয়েকটী নূতন ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আমরা যেমন গৌরব অনুভব করিয়াছি, সেই সেই ঘটনায় যাঁহারা কোন-না কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহারাও তদ্রূপ নিজেদের কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় দিয়া অনেকটা তৃপ্তি ও কিছুটা আত্ম-সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছেন।

(১) "সাহিত্য-সমিতি"—গত ২রা মার্চ্চ বৈকাল ৩।০ ঘটিকায় এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। সভাপতি হইয়াছিলেন "প্রবাসী"র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার অভিভাষণ অন্যত্র ছাপা হইয়াছে। সাহিত্য সমিতির সম্পাদক প্রেরিত পত্র হইতেই সভার সকল বিবরণ পাওয়া যাইবে।

সম্পাদক যুগলের কাজে ঔদাসীন্য দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়াছিলাম এবং গত সংখ্যার পত্রিকায় এ বিষয়ে একটু কটাক্ষপাত করিয়াছিলাম; কিন্তু প্রথম অধিবেশনের সাফল্য দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি। ভবিষ্যতেও ভাল ফলই দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করি।

(২) Historical Society—এই সমিতির প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবনীনাথ বসু মহাশয়। সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য "Battle of Valmy" শীর্ষক একটি ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এবং আরও দু'একজন দু'একটি রচনা পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় পঠিত রচনাগুলির স্থূল-বিস্তর সমালোচনা করেন এবং ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কয়েকটি কথা বলেন। ইহার পর সেদিনকার মত সভার কার্য্য শেষ হয়। প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বহু ছাত্রই উপস্থিত ছিল

উক্ত সমিতির সম্পাদক উদ্যোগে আরও একদিন প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক ইতিহাস শ্রেণীর ছাত্রেরা অধ্যাপক অবনীবাবুর সহিত কলিকাতা মুজিয়ম দেখিতে যায়। সেখানে অধ্যাপক মহাশয় প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। আমরা ইতিহাসের ছাত্র না হইলেও ইঁহাদের সহিত যাইবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল।

সমিতির কাজ ভাল হইবে বলিয়াই আশা করি।

(৩) কলেজ স্পোর্টস্—গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী আমাদের স্পোর্টস্ হইয়া গিয়াছে এবং এ বিষয়ে একমাত্র লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে যে এই প্রথম আমাদের কলেজে স্পোর্টস্ হইল। কলেজ-পত্রীতে ইহা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এইজন্য Games Secretary শ্রীমনোরঞ্জন কুমার ও Games Captain শ্রীনকুলেশ্বর দাশগুপ্ত বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

একটু দেরীতে হইয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা ইহাতে

যোগদান করিতে পারে নাই। আগামী বারে আরও শীঘ্র করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই স্পোর্টসে একটি উপভোগ্য বিষয় ছিল—Tug-of-war বিজয়ী-দলের সহিত (তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রেণীর দুই চারিজন) অধ্যাপকদিগের রসি যুদ্ধ। দুঃখের বিষয় অধ্যাপকদল হারিয়া যান।

মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন।

(২) Economics Society—শ্রীঅজিত কুমার ভট্টাচার্যকে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া উক্ত সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহার স্থায়ী সভাপতি হইতেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সমিতির প্রথম অধিবেশন সম্প্রতি হইয়াছে। সমিতিটি দীর্ঘজীবি হউক—ইহাই কামনা। আধুনিক অর্থসঙ্কটের দিনে এইরূপ সমিতির প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই আছে।

* * *

এ বৎসর কলেজে অনেকগুলি সমিতি নূতন গঠিত হইয়াছে। ইহারা "ভেক-ছত্র"-রূপ ধারণ না করিয়া স্থায়ী হইলেই বিষয়টী সুখের হইবে। ভবিষ্যতে যাহারা থাকিবে তাহাদের উপরই এগুলির স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে।

* * *

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় "ভুবনমোহিনী মেমোরিয়াল্" প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটি পদক পাইয়াছেন। আমরা ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

প্রবন্ধটি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

আমাদের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী শ্রীকুমুদচন্দ্র সেন-গুপ্ত কলেজ জীবন শেষ করিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব সংখ্যায় আমরা আমাদের শিক্ষার বিষয় অনেককিছুই লিখিয়াছিলাম কিন্তু শ্রীকুমুদ চন্দ্রের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়া আমাদের সে ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। পত্রখানি স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। আমরা আমাদের অন্তরঙ্গ সহপাঠী ও সহকর্মীর বিচ্ছেদে অতিশয় দুঃখিত [illegible] তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হউক।

—বিশেষ তাড়াতাড়ি করিয়া এবারকার কাগজখানি প্রকাশ করিতে হইল, স

তবু অনেক ভুল-ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। ভাল রচনাও তেমন কিছু পাই নাই; ইহার উপর আমাদের ভগ্নীরাও এবার আমাদের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগীতা করেন নাই; সুতরাং কাগজখানিকে আশানুরূপ ভাল করিতে পারি নাই।

সম্মুখে সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ। এ ছুটী ভালো লাগে না: বন্ধু-বান্ধবহীন নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরকে মনে করিলেই ভীত হইয়া পড়ি কিন্তু রোজ কলেজ ওতো ভাল লাগেনা। মানুষ কোন কালেই, কোন অবস্থাতেই সুখী নয়। যাহা হউক, অবকাশ শেষে আবার দেখা হইবে। আজ এইখানেই ইতি—

আমাদের প্রীতি নমস্কার রহিল।

ASUTOSH COLLEGE
MAGAZINE

VOL. X | APRIL, 1934 | NO. 3

Blaze, O Fire!

(Amiyaratan Mukherjee, Third Year Arts)

Blaze, Oh Fire! blaze—
Blaze an' brighten our Youth with light
and spirit!
Blaze, Oh Fire blaze—
Oh the Vital Cause of the World!
Blaze an' brighten our Youth with gravity
and love!

Blaze an' cleanse our Soul,
and drive the gloomy Slumber of
Death—
and bring in its place
the lightful vigil of Life on us!
Blaze an' light up our life—
and end the dark dead habit of life into
emptiness and nothingness!

Let the penance of our Grave Youth,
be illumined with thy glaze,—

Let the spirit of our Wild Youth gain the
rays of twelve Suns,
Blaze, Oh Fire! blaze—
an' blazon the spirit of Youth!.....

Blaze, Oh Fire! blaze—
And spread Thy Spirit o'er the Sky and
Earth!
Blaze, Oh Fire! blaze—
Oh the Vital Spirit of Heaven!
And come near us to make us burn
the World of Death
into ashes and dust under our feet!

Blaze an' lighten our eyes,
and make 'em able to see the path
of Truth and Beauty,—
Blaze an' brighten our eyes,
and make 'em able to burn
the World of Dark!

Let thy favor, smile o'er our head,
Let thy blazing flame dance a
Sprightly dance in our heart,—
Blaze, Oh Fire! blaze—
an' blazon th' spirit of Youth!..... *

March 10, 1934

*Written from the impression of a Vedic "hymn to Fire" by "Biswabara" in Rig- Veda.

Henrik Ibsen

Jyotirmoy Ganguly (Third Year Arts).

THE rise of Henrik Ibsen may be rightly called the happy revival of dramatic literature in Europe. By revival it is meant not that the Pre-Ibsenian dramas were negligible in number, but that most of them fell short of the required quality, the quality which marked the art of Marlowe and Shakespeare, Sheridan and Oscar Wilde; and it is this decadence from which Ibsen saved the European drama. The flaring beacons of intellectual activity, like Milton and Matthew Arnold, Byron and Shelley, Tennyson and Browning, they had all tried a hand in play-writing, but unfortunately they wanted to please more their own selves rather than the play-going public. The result was that they were appreciated only before the table-lamp and never before the footlights. On the other hand, most of the nineteenth century dramatists were so busy with the technical and the objective side of drama, that they absolutely forgot that essential element which differentiates drama from circus show. This sterility of the art of play-writing hinted at the coming of a great storm, which would revolutionise the conception of dramatic literature. The storm came with the appearance of "*A Doll's House*."

Ibsen was born in 1828 at Skien in Norway. With a scanty education and an unenviable purse, he came to live at Christania at the age of twenty. At this time, the literature of almost every country in Europe was in the full-tide of Romanticism, the greatest revolutionary wave after the Renaissance movement that swept over the face of Europe. The violent shock of the French Revolution was still green in the memory of the people and gradually a new spirit was entering into their soul. In England, Byron, Shelley and Keats, in France, Maupassant, Beaudellier and Balzac, in Russia, Tolstoy, Turgeniff and Dostoiff'sky were singing in praise of the new religion. Ibsen was also swept away by the flood. He had the opportunity to come in close contact with a play-house, and chose the domain of dramatic art as his gymnasium. The impetus which once helped to produce a Shakespeare,now produced an Ibsen. His literary genius began to assert itself and in 1850, he produced a blank-verse tragedy, "Catilina." The attempt did not succeed very well; but it has had its own value, being the first drama written by a Norweigian.

In 1851, Ibsen was appointed Director of the newly established Bergen Theatre. Here he directed nearly a hundred and fifty plays, half of which was by Scribe. To Scribe, more than to any one else, he owed his knowledge of dramatic technique. But he took only a few years to outmaster his master, and tried to introduce novelty. The Scribean plays had a defect; the plots were obscured and injured by the dramatic tricks, and Ibsen had to discard them off. He learned the deftness of Scribe, but cast aside his art of plotting which over-shadowed the characters and the situation.

Ibsen's dramas, or rather the best of them, are dramas of idea, of problem, and it is generally believed that in this respect he owed much to Hebbel, the great German play-wright. Indeed the two dramatists had many things in common. Both of them wrote plays of problem in an analytic method, and both presented situations, the origin of which lay in the distant past. But the idea that one was the guide of the other is a mistake. "The analytic method and the unveiling of the past were a natural result, and were long introduced before Hebbel as the consequence of the imitation of the structure of French drama in the 18th century." Hebbel only showed how effectively it may be produced and thus paved the way for Ibsen.

What the French dramatists introduced and Hebbel expounded, was established by the powerful pen of Ibsen. But it was the frame which he took; the portraiture was his own. The French dramas were like so many reform bills introduced by lawyers, who forcibly bent the two ends to meet to carry their point, and this artificiality marred the reality of the plot. Ibsen presented problems but never tried to solve them; he knows that the enigmas of human life are too complex "to be cleared by a pistol-shot." In 1878, he wrote an essay on Modern Tragedy, and put forth his views. On this foundation was built "*A Doll's House*" which marked the turning point in the history of dramatic art in Europe.

"A Doll's House," "Ghosts" and "An Enemy of the People" these are actually the three dramas which made Ibsen famous. The first gave rise to hot discussion, the second to agitation and the third to condemnation. For "An Enemy of the People" the modern democratic world would never forgive Ibsen; because never did a more powerful writer take up his pen against the mob. We can do no more than hate him in our minds, being rendered helpless and 'tongue-tied' by his faultless logic and sting of exposure.

It was 'A Doll's House" which forced the interest of the world

upon Ibsen, and it is the drama by which Ibsen is remembered and referred to to-day. The theme of the play is the awakening of the sense of responsibility in a woman, who from her childhood is treated as a breathing doll, as the name of the play signifies, and her emphatic assertion of a right of individual self-development. The problem of a woman,who is regarded as her husband's movable possession, as a 'thing' in the language of Falstaff, had once been treated by Hebbel, the German dramatist, before Ibsen took up and developed the theme.

The conduct of Nora, the heroine of the play, is open to controversial opinions. She leaves her husband, her children, her home to claim her right, to be respected as no inferior to man and the question whether she was right to do so or not, was hotly discussed. Some said Ibsen thinks too much of the rights of woman; others opined he is a destructive "philosopher." But Ibsen was neither of the two. He did nothing more than present a chapter from the complexities of human life, and never cared to solve it. It is here we find the departure of Shaw from the path of Ibsen. Ibsen knew that human problems are not so easy as to be solved in the wink of an eye; Shaw takes up his pen with both the problem and the solution in hand. Ibsen's characters are not known to him till the curtain drops; they are full of the situation. But Shaw knows what situation he is going to present, and his characters are moulded beforehand to suit the background. To Ibsen characterization is of more importance; to Shaw the situation is above everything else.

The theme of "Ghosts" is the evils brought in by ill-matched marriages, and the recurrence of the father's disease upon the son. The idea also occurs in 'A Doll's House' where Tovald Helmer refuses to trust Nora with the charge of the children, after her conduct was detected. "Ghosts" was written in 1881. The attack and the abuse that Ibsen had to suffer for publishing this play was seldom experienced by any other author before. The year 1881 was modern but not so modern as to scrape off all conventions and traditional sentiments plastered by age after age, and it was inconceivably daring for Ibsen to publish a play on a theme "aesthetically repulsive." But apart from that it is the greatest product of that immense intellect. All through the scenes, the reader's mind passes through a very high tension till the "catastrophe" comes,and then it meets perhaps the greatest tragic climax ever achieved by a dramatist before or fter.

But it must be admitted that as a drama of action, "Ghosts" is a failure; because, first, it is more a diagnosis than a story; secondly, the subject is so repulsive to conventional sentiment that performance on a public stage is still wellnigh impossible; and thirdly, Ibsen's character sketching in this play is very poor, of course in proportion to his ability. He might as well have written an essay for his interest is openly more on the objective side.

"An Enemy of the People" is a reply to the violent attack on Ibsen after the publication of "Ghosts." To speak the truth, this drama is of more value to the student of politics than to the student of literature. Personal greivance has made the author's arguments much more sharp than those of any political philosopher who ever dwelt on the demerits of mob-rule. Dr. Stockman, the hero of the play, is presented as a great upholder of truth, ready to give up anything and everything rather than his principle. Of course, Ibsen changed his idea later and admitted that it is sheer folly to try to live by principle alone. Failure to adapt himself to the world, like Hamlet, brings about a tragedy on Greger, the hero of the Wild Duck. Man cannot live by the ideal minus the practical side of the world; he must compromise or get out.

The technical side of Ibsen's dramas, is not less important. The characteristics of modern drama, its naturalness of dialogue, reality of situation, absence of such artificialities and absurdities as soliloquies and asides, were first introduced by Ibsen. The tendency towards naturalism got its first impetus from that great Norweigian genius. The putting of an exciting scene at the end of every act and a great scene artfully delayed and carefully prepared at the end of the play, for this idea, no dramatist of modern Europe can deny his debt to Ibsen. Strict adherence to the unities accounts for the close-knit form of all his plays. In dramatic economy no playwright has yet been able to surpass him. There is scarcely a single line in all his works which is insignificant or has no bearing upon the characters or the situation.

Ibsen is a Shelley under the influence of a Milton. It is the queerest of all queer things, how a person could be so romantic and so puritanic at the same time. We find in him the same violent force and outburst of passion, as in Shelley, but counterpoised by a serene Miltonic restraint.

In the last phase of his literary career, Ibsen becomes a symbolist. Symbolism was regarded so long as the most absurd "ism" to offer to the common gusto. Before Ibsen the intelligence and understanding of the play-goers were never challenged by any

author with the slightest subtlety. With him we find the rise of the modern audience. Ibsen's art was never meant for the commoners as no higher art ever is. He addressed only a small and chosen circle composed of a few intellectual persons. He did not allow himself to be a victim of mob-tyranny, as even Shakespeare to a considerable extent did. Those admirers, afraid of the barracking of the play-going public, at first staged the dramas within the four walls of their own club house. Gradually they multiplied themselves and one fine night Ibsen found himself universally adored as the most popular playwright of the age. The hard nut he had offere to the commoners was cracked by this time, and the absence of soliloquies and asides no more arrested their understanding.

The modern age will remain for ever indebted to Ibsen for two things: first, his part in the development of the modern audience which paved the way for dramatists like Shaw and Galsworthy, Maeterlinck and Strindburg; and secondly for the independent spirit or the strong individualism of modern playwrights. It was from him that individualism in dramatic art began. He was a fanatic for individualism as he proves himself in the "Enemy of the People."

N.B. -The author is immensely indebted to many authorities, and especially to Dr. Clive Stuart's learned treatise on the subject.

Lotos-Eaters: A Choric Song.

(A Short Criticism).

Nikhil Ranjan Banerjee, Ex-Student.

Introduction.—It is an established fact that Alfred Lord Tennyson, the Poet Laureate of the Victorian Age, which saw a noble outburst of literary activities in England, excelled in delineating the variegated feelings of human heart. His workmanship in harmonising emotion with rhythm of sound reached its high watermark of glory in his *Lotos-Eaters*. In it he displayed such a wonderful felicity of expression and marvellous mastery over rhythm, music and versification that no parallel comparison can be drawn with any other poets of the age so far as the lyrical poems are concerned. "The whole poem," says Mr. J. H. Fowler, "is one of the finest of those classical studies in which Tennyson's art, by general consent, is consummate." In 1883, when Tennyson was not yet twenty-four, he published *Lotos-Eaters* in a book under the caption "*Poems, Chiefly Lyrical*," which met with adverse criticism.* It rivalled Keats and Spenser in sensuous beauty and Shelley in sweetness of melody.

Source.—Tennyson's *Sea Fairies* may be called the forerunner of *Lotos-Eaters* in which the thought is the weariness of the world. "Why toil so much for so little? Take the joy of rest and love. Sleep, before the great sleep." It is interesting to note how splendidly he wrought out this simple thought in *Lotos Eaters*. How sincerely he felt the pathos which touches the innermost core of human heart —

> Death is the end of life; ah why
> Should life all labour be?.....

He borrowed very little from Homer. In the *Odyssey*, it is written that in the tenth year after sailing from Troy, Ulysses arrived at the land of the Lotos-Eaters. Three of his men set out to see what sort of people lived there. They found the

---

* "Alfred is an owl: all that he wants is to be shot, stuffed and stuck into a glass-case, to be made immortal in a museum"—writes a critic in Blackwood's Magazine (Vol. XXXI).

dwellers to be quite inaggressive and hospitable. So they freely mixed with them and tasted their sweet Lotos honey which caused an oblivion in their minds of all the woes of the world. The result was that the mariners realised the uselessness of their struggle for existence and consequently they were loath to leave the shore. But in the *Odyssey* there is no description of the land of the Lotos Eaters. The poet has invented the landscape and used it as the background. The landscape is echoing, as it were, the deep feeling of the mariners. The sense of the poem is conveyed to the mind by the sound of the words he employed. He beautifully describes the land of the Lotos Eaters, which is purely an imaginative creation, with an unbroken flow of rhythm and clearness of style that lull the senses to sleep:—

Here are cool mosses deep,
And through the moss the ivies creep,
And in the stream the long-leaved flowers weep,
And from the craggy ledge the poppy hangs in sleep.

Philosophy of Tennyson.—The chief interest of the poem is human interest. The soul cannot satisfy itself with the transient illusion of the illusive world. The soul is hankering after eternal salvation from all the woes of the world. The soul longs for the complete cessation from all activities in *Nirvana* fashion. The cool and deep mosses with creeping ivies, long-leaved flowers that droop in the stream, the poppy hanging from the rock ledges, all these aspects of nature point to the supreme need of rest and set the mind questioning why should we alone toil and moil while others have rest from sleep?

Why are we weighed with heaviness,
And utterly consumed with sharp distress,
While all things else have rest from weariness?

Life is a long weary tale of struggle. We are constantly thrown from one sorrow to another and make perpetual moaning. Therefore the more we avoid work the happier we are. Happiness is a state of quiescence and inactivity. If death be the end of life then what good is there to struggling for a short period of time and then being hushed into eternal silence. Let life be one long dream, one soft repose and let no jarring conflict approach it.

"Give us long rest or death, dark death, or dreamful ease." From this point of view *Lotos-Eaters* is in contrast with his *Ulysses* in which the ideal of activity is depicted allegorically. The philosophy of life as laid down in the *Lotos Eaters* is very different from his own. In the *Lotos-Eaters* the poet is over-

whelmed with grief for the time being and views the world as a worthless lump of dust full of troubles. He argues that inaction is to be sought and activity to be avoided:—

Surely, surely, slumber is more sweet than toil, the shore
Than labour in the deep mid ocean, wind and wave and oar;
Oh rest ye, brother mariners, we will not wander more.

But in *Ulysses* the poet has become more enthusiastic and given up his stoic mentality. Here, as some critics suggest, he has followed the great master Dante for his ideal. Tennyson's Ulysses, like Dante's, is setting for another voyage, after ten years' long sea adventures, with a handful of crew. Ulysses is sick of idle life at home. So he says:—

I cannot rest from travel: I will drink
Life to the lees: all times I have enjoyed
Greatly, have suffered greatly, both with those
That loved me, and alone; on shore, and when
Through scudding drifts the rainy Hyades
Vext the dim sea.

Here Ulysses represents the restless spirit of research which characterises the modern man. An inquisitive man cannot rest satisfied with things already acquired. He is pursuing the ideal eternally.

Following books have been consulted. Tennyson's Mind And Art, by S. A Brook. Memoirs of Tennyson, by his son. Lectures delivered at the Tokyo Imperial University on English Literature by Lafcadio Hearn. Victorian Poetry by Drinkwater and Blackwood's Magazine, etc.

The Reverie of a Romantic Girl.

Bani Rai, Second Year Arts.

WHO says life is worth living? I deny it. It is like hell—always burning, burning. It is a riddle not solved as yet. It is a swift panorama of passing events without any coherence.

Readers, I assure you I am not a bit philosophical and my writing has nothing to do with philosophy either. It is simply a 'penning down' of scattered thoughts and—well, nothing else.

The indolent days of summer strangely affect the mind. As I sit here before the wicker table with my embroidery I feel absolutely lonely. Yes, my friends, lonely. This dazzling bright sky overhead, this dry but soothing breeze, these palm-leaves cannot touch my mind. Unlike Wordsworth I see them but can not realise their sign ficance.

At present I am fed-up with life. Ah the perpetual parties, dinners and marketings, cinema-goings and love-makings! "The world is too much with us." Of course I do not shun society, but whatever I am compelled to do for gentle courtesy's sake, I do with scant willingness. I dress up nicely but do you actually know what for? For my mother's sake. The blessed lady is always upon me like hot water calling me "you naughty thing," if I neglect outward charms. But my mind always revolts against those artificial decorations!

These words may ring untrue to the ears of casual readers but those, who will probe deeply into this simple narrative, will find a great philosophical truth lying herein. I have realised the shortness of life and the vainness of transitory pleasures. Eh, what are we?

"Infant crying in the night,
Infant crying in the light,
With no language but a cry."

Everything is unreal—chaos in apparent cosmos.

By the bye, have you read the 'Rubaiat of Omar Khayyam?' It is a good book, though I cannot understand more than half of it. But does it matter much? Just memorise a few lines and whenever you see an oppertunity recite them looking profoundly gloomy. At once you are pronounced as a combination of the

philosopher, the thinker and the poet. For instance, you are present at a party, your friend has chanced to remark, "Spring has set in early." You just sigh and mutter (loudly enough to be audible of course:)

"Alas, that spring should vanish with the rose,
That Youth's sweet-scented Manuscript should close!
The Nightingale that in the Branches sang,
Ah, whence, and whither flown again, who knows!"

And you are adjudged romantic.

They say I sham romanticism. But to tell you the truth *I am romantic*. The commonplace things around cannot please me. My heart wildly rushes after perfection. Well, I may sometimes look like a person of 'common rout', 'head without name' as Milton chooses to put it, but that is my outward appearance. What I am nobody knows, I am a mystery.

I even do not care for a bit of innocent flirtation. I am tired of *beaux*. These silly nonentities! worthless rotten cheese! What care I for them? A girl of my mind can have no attraction for fools. I want a hero, and he must be melodramatic. He will come in a glowing chariot, with a sort of halo round his head, and looking like a 'Don Juan' or a 'Gay Lothario.' He will fight the Dragons and Octopuses and he will cry in a trembling voice—"Ah lady of my heart, here I am," instead of being a modern youth who will bow, hat in hand, and say in a feminine voice, "Miss Mitter, may I see you home?

I am romantic. Every one is convinced of that. My mind is delicate as a daisy that 'opens wide to the coming of night. It is like anemone that closes at breath and dies at a touch'. Other girls envy me because I am made much of. They declare that I am not indifferent to compliments and I condescend to the effort of looking nice! The impudent, brazen-faced hussies! I am far above them. I am romantic.

* * *

Really I was asleep. Oh, it is getting late for the party at Mrs. K.'s. I have to go there first so that I may coax Mrs. K. to let me have the part of Rosalind in *As you like it* instead of giving it to Neela. This is indeed the most important part in the whole charity performance and if I get that I will surely be a talk!

So let me hurry up. I think purple suits my complexion better than blue. I wonder if I look nice!

Battle of Valmy

Deba Prosad Bhattacharjee, Third Year B.A. Arts

ABOUT the last part of the year 1792, France was hard pressed from every direction. The life and death struggle between the Girondists and the Jacobins, the disastrous Civil War, themenacing plots and intrigues, and, above all, the weakness of the army—all combined to discredit the cause of the revolution. The Prussians and the Austrians were advancing more and more--the Prussians towards Paris and Austrians towards Vienna. Before the well-trained, well-organised and well-officered troops of Prussia and Austria, the French army had even not the strength of a frail reed. Ill-disciplined, without good training and commanded by the officers without any experience of the battle-field, the French armies were being easily routed by the invading armies of Austria and Prussia. Place after place, fortress after fortress fell into the hands of the invaders. Longway and Verdun capitulated and it seemed certain that there was no hope of saving Paris from falling into the hands of the Prussians. Everything seemed lost for France and her fate seemed as dark and gloomy as the September sky of that year.

But France, threatened though she was from every side, was not to perish—her conscript army came to her rescue. The young soldiers saved France and the revolution from the threateing destruction by checking the advance of the Prussians at Valmy. Dumouriez had replaced La Fayette in the command of the army. He had practically re-organised the army and this done he had set himself to breathe courage into the men. And with these brisk and vigorous soldiers he had sworn to defend the Argonne "the Thermopylae of France."

While Dumouriez was remodelling his army and rousing his soldiers with patriotic enthusiasm and joyous confidence, Brunswick was moving very slowly and doubtfully towards Paris. He might have forced his way through the very day after he took Verdun. But he could not yet fix his plan of operation. He was in favour of capturing other places rather than marching on Paris, but the king wanted the fall of Paris and ordered him to march towards it. So he was being torn between his ideas and his duties, his own plans and those of the king, his master. More-

over his army—that celebrated "Courec Prussienne"—was growing strangely demoralised. Soaked with rain, down with dysentery, and its courage damped, the famous infantry of Prussia was moving slowly and with uncertain steps towards Paris.

Taking the advantage of the slowness of Brunswick, Dumouriez and Kellermann—he joined Dumouriez at Metz—seized the opportunity to march on Argonne. Moving along the enemies' left flank when they reached "the pass of Thermopylae" they saw that the Germans had already forced their way through at two points. Then it appeared to Dumouriez that the plateau of Valmy, a spur of mountain chain running out into the Campagne country, if fortified, might yet afford a strong front in checking the advance of the enemy. He urged Kellermann—recalcitrant at first—to occupy the plateau of Valmy and it was on 20th September at 11 o'clock under a gloomy sky that Kellermann, in front of the mill at Valmy, which the Prussian bullets were battering, stuck his hat with its tricolour feather on the point of his sword and shouted "Long live France." And France was going to live. Everything was plunged in heavy fog and when it lifted the Germans for the first time caught sight of the tricolour flags waving over the troops who presented a steady front to the enemy.

The fighting began by a discharge from the big guns of the Prussians and when the volley of the shots was unable to dislodge the French from their position the formidable infantry of Prussia was ordered to advance. The French soldiers were singing "The Ca-ira" and "The Merseillaise" waving their hats, shouting "Long live the Nation". The first shock of the attack was well endured by the French and they came out successfully from the ordeal. Then they began to send a hail of shot upon the Germans. The Germans were not ready for this. They could not even dream that those "tailors and cobblers" in blue jackets could aim and fire so accurately. They fell into co ıfusion; but the French inspired with the "Ca-ira" and the "Marseillaise" were calmly defying the volleys of shots. The rain was coming down in torrents and the Prussians were losing ground more and more. Suddenly Brunswick turned to the king of Prussia and suggested that fighting should cease. Frederick William complied and the Prussians began to retreat.

The French had won the day. The "blue Carthen wares," as the *emegrees* called the French soldiers, strengthened with the fire of enthusiasm had checked the victorious march of the invincible "Courec Prussienne." The news of the victory of the French was astonishing to Europe. People wondered how the ill-trained, ill-

disciplined and ill-led volunteers could check the advance of the regular and mighty army of Prussia. The great historian Tocqueville too, when he first heard the success of the French, became very much astonished. He hurried to the field of the battle and there while he was sauntering he caught sight of some of the dead bodies which had only sticks and rods in their clutches. On examination he found that those were the bodies of the French soldiers. This fact at once answered him the question how the French had won the battle. The French nation was at arms and every one wanted to save its country at any cost. He then perceived clearly that the French had that advantage over the Prussians which the Romans had over the Carthaginians and the Greeks had over the Persians. Strengthened by the enthusiasm and will to save the country the French soldiers could drive back the Prussians—the Prussians could not stand the patriotic fury and the sacrificing enthusiasm of the French.

The significance of the victory at Valmy was great. It saved France fram falling into the hands of the foreigners. The Prussians dared not advance and the lost places were recovered one after another. Moreover, the moral effect of the victory was immense. It brought a new era in the history of France as well as of Europe. "The soldiers excited by their success made it—like Goethe among the Germans—the point of the departure of the new era." They became shod with confidence. Henceforth there was no need of a Dumouriez to incite them to joyous confidence: they were sure of themselves now. With the tradition of Valmy the French army, like a host of meteors, swept over the whole of Europe for a quarter of a century invincible and irresistable in their course. Thus "the great nation capable of the conquest of the world was to leap from off the knoll at Valmy."

REVIEW

Prof. Mohinimohan Mukherjee, M.A.

PREM-O-PRATIMA: Published by M. C. Sarkar & Sons, Calcutta. Price Re. 1. Pp. 1-44. A collection of poems.

Mr. Romes Chandra Das, M.A., the writer of these poems, was a distinguished student of this college. He has already made his mark in the field of fiction and short stories. The sheaf of luscious lyrics included in this dainty volume may be called a cycle of romance, delineating point by point the dawning love of a Bengali girl with all her fantasies, moods and attitudes.

The young poet has entered with a gusto into the inner chamber of her mind, and with a fine brush depicted a life-size portrait of a typical *Damozel* of our province. The easy rush of the lines, the various inset pictures of the cycle of romance, the redolent atmosphere of the stanzas, the *lacrimae rerum* in some of the touching moods, the purely physical charm of the girl, and the majestic grace of some of the fourteen-liners,—all make up an agreeable intellectual repast, at once pleasing and stimulating. Some of the pen-pictures inevitably remind us of the mediaeval *chansons* in which the various phases of the ladylove were described with intense longing and even morbid pathos. But the comparison that we make is but skin-deep. In these poems the robust and rounded beauty of an unsophisticated village-bred girl weaves a silken spell round our mind and finds an echo in our soul. "Prem-o-Pratima" is undoubtedly a rich contribution to our ever-growing poetic literature.

The only thing which strikes a discordant note is the fact that the writer has made copious use of slang, which has been a misfit in almost all places where such words have been used.

Sarswati Puja Account

Collection.	Rs. As. P.
(a) 1st Year I- A. Sec. A	12- 4-0
(b) 1st Year I. A. Sec. B	16-10-0
(c) „ „ I. Sc. „ A	12-12-0
(d) „ „ „ „ B	10- 4-0
(e) Second Year I.A. and I.Sc.	31-14-0
(f) 3rd Year B. A.	24- 6-0
(g) 3rd Year B.Sc.	2- 8-0
(h) 4th Year B. A.	6-12-0
(i) 4th Year B.Sc.	1- 0-0
(j) Professors	23- 6-0
(k) Ladies' Section	36- 8-0
(l) Other Collection	4- 0-0
(m) From Common Room Fund	5- 0-0
	186-14-0

Expenditure in Abstract

		Rs. As. P.
(a)	Image	33- 0-0
	Do. Conveyance	3- 0-0
(b)	Puja	21- 0-9
(c)	Earthenwares	4- 1-0
(d)	Prosad Bhog	65- 9-9
(e)	Decorations	14-14-6
(f)	Immersion of Image	4- 0-0
(g)	Miscellaneous—	
	Bearers	4-12-0
	Cigarettes etc.	1-11-0
	Refreshments	1-10-0
	Bus fare	1- 5-0
	Caricature	1- 0-0
	Printing	2- 0-0
	Paper	0- 7-0
	Envelopes	0-12-0
	Stamps	1- 3-6
(h)	Contrbution to Mayor's Earthquake fund	25- 0-0
(i)	Amount spent out unaccounted	1- 6-0
		186-12-6

Sukesh Chandra Banerjee Third year Arts.

Editorial

HAIL, BAISAKH!

The new year dawns upon us and instils new life. Hail, Baisakh, hail? Let us have fire-baptism. Let us not be moribund; let us not despair. May we hope and hope—may we move on and on towards the goal of perfection; may we realise in the very core of of our hearts—

God's in his heaven,
All's right with this world.

In the new year let us join hands and take a sacred vow—a vow of crusade for the liberation of the human soul, for the upliftment of the poor and downtrodden, for the true worship of *Satyam, Sivam, Sundaram*,—the *Summum bonum* of life. Let us not be light "half-believers of our casual creeds; let us have faith which removes the mountain; let us have joy "in the wide commonality spread"! let us have hope—robust hope with forward but not reverted eyes. Let the faith of Victor Hugo be implanted in us, the faith that makes him utter, "*La vie est une fleur, l'amour en est le miel*" (Life is a flower, and its honey is love); and let us always act up to that faith. Finally, let us sing with Tennyson—

Ring out false pride in place and blood,
The civic slander and the spite;
Ring in the love of truth and right,
Ring in the common love of good.

THE COLLEGE BUILDING.

We are glad to announce that the foundation of our new College building and the Memorial Hall will be laid very soon. The joint College and Memorial Committee have launched into a gigantic project. We wish them godspeed. The hearty co-operation, muni-

ficence and self-sacrificing spirit of the public and the students and ex-students of our College are the only solid ground on which this project may take a concrete shape. The building, when completed, will fill a long-felt want to South Calcutta and will remain as a lasting and ever-growing memorial of that great savant who was so much to the Indian youth.

ABOUT OURSELVES.

Recently the College sports were held with great *eclat* in the Hazra Park. Mr. C. C. Biswas, M.A., B.L., C.I.E., a member of our Governing Body, kindly took the chair and awarded diplomas and trophies to the deserving competitors. Tho Principal took a very keen interest and was all attention to the guests. The staff and the students of our College mustered strong to encourage and inspire the competitors. The meeting was a great success. The Captain and the Games Secretary deserve special thanks for their excellent mangaement.

* * *

The inaugural meeting of our Sahitya Samiti was held under the presidentship of Sreejut Ramananda Chatterjee, Editor, Prabashi. It was a great success. The readers will find a full report of the meeting in the present issue of the magazine. The President's speech, short but instructive, has been published in the Bengali section of this issue.

* * *

The first meeting of our Historical Society was held on the 26th February under the praidentship of Prof. Abaninath Bose. Several papers were read; and those of Anilkumar Chakravarty and Devaprosad Bhattacharjee deserve special mention.

* * *

The inaugural meeting of one Economical Association was held on the 21st April under the presidentship of Prof. Benoy Kumar Sarkar. Sj. Anilkumar Bhattacherjee read a paper on the present

Jute problem, and Sj. Nakuleswar Das Gupta read a paper on unemployment and its remedy.

* * *

It is pleasant to note that Babu Bivas Chandra Roy Chowdhury, a writer repute has joined our College as an honorary Professor of Bengali. He is the eldest son of our Prof. Kumud Chandra Roy Chowdhury. The students of his class feel much benefitted by his lectures.

* * *

We offer our thanks to Parltosh Ganguly, a student of our first year class, who has kindly permitted us to print one of his poses in his physical feats. We are glad that we have in our midst a physical culturist of his type. It is no high praise if we say that he is an acquisition to our College. We hope he will keep up the tradition of that College which can boast of Digen and Sorashi as its ex-students.

* *

As we go to the press, we are aggrieved to hear that circumstances have forced Sj. Kumud Nath Sen Gupta, Secretary of the Common Room, to severe all connections with us. He was called away from the dreamland of academical life to play his part and do his bit in the universal struggle for existence; but he has left in us an indelible impression of his amiable personality and his competence as an organiser. May God make him happy and prosperous in life.

* * *

With great sorrow we announce the death of Mr. Baidyanath Mukherjee, formerly a student of our College. He was just 25 at the time of his death. He was a keen and brilliant sportsman. He was fortunate to secure to the champianship of Calcutta Atheletic Sports and to win the laurels in the Intercollegiate Sports. He began his sporting career at the early age of 13 when he was in the Y. M. C. A. Boys' Branch and by his wonderful talent came to be recognised as one of the finest sprinters of his day. Loved by

professors and students all alike he departed with a serene smile on his face and all his activities have been cut short by the cruel hand of Death. Recently he gave up all sorts of sports owing to his failing health. We offer our heart-felt sympathy to the bereaved family to whom the loss is irreparable.

Mr. Girija Roy Chowdhury has presented a lovely set of Balzac's Works to the College Library in memory of his beloved friend, the deceased. We thankfully acknowledge the receipt of the set.

THE WORLD OF TO-DAY.

Japan, the land of the Rising Sun, remains the Sphinx to the rest of the world. She does things in a manner which baffles explanation. She has recently introduced a new and hitherto untried method in international politics by crowning Puki, the former Emperor of China, as the Emperor of Manchquo, annexed by her after a successful war. In the same spirit she has declared that she has not annexed it; and the crowning of Puki is the undeniable evidence to prove her assertion. China issued a protest; but it was only crying in the wilderness. The colossal indifference of the League of Nations seems to have emboldened Japan in her present action; and it is rightly apprehended that, if no stumbling block be placed on her way, her thunderous career will never stop. Last year when Japan 'let slip the dogs of war' in China no faint voice of protest was heard; and when the Lytton report was placed before the League for consideration, Japan simply walked off with a non-chalance unparallelled in modern history. "What next?" Is the question that suggests itself; and the world waits for an answer with held breath.

* * *

The Four Power Pact has now become a misnomer owing to the excess of the Nazi Power in Germany. Signor Mussolini has his eyes turned upon Austria, a democratic country, for finding a a way out of the crisis. There, Dr. Dollfuss, the leader of the Social Democratic party, was appointed Dictator in order to take a bold stand against the Nazi. But the fact is that he has sold the Power to Italy.

* * *

EDITORS

1924 — Prof. Mohinimohan Mukherji, M. A.
1925 — Basudev Banerji
1926 — Bibhas Rai Chaudhuri, S. Raghavachari
1927 — Subodh Biswas, Dhiren Lahiri, Satiranjan Banerjee
1928 — Sachibusan Barik, Kalyankumar Sen Gupta
1929 — Asok Kumar Banerjee, Shymapada Mukherjee
1930 — Kausik Kumar Mitra, Provat Kumar Bose
1931 — Shyamapada Mukherjee, Profulla Kumar Sarkar
1932 — Batto Kristo Banerjee, Amiya Ratan Mukherjee, Bireswar Chatterji
1933 — Hariprasanna Chakravartty

Annual Subscription in India including postage: Rs. 2-4-0
Foreign: 4 shillings. For ex-students of Asutosh College: Rs.1-8-0

Professor-in-charge Prof. B. GHOSHAL, M.A., B.L.

Printed at NEW PEARL PRESS, 16, Kalidas Patitundi Lane, and
Published from 147, Russa Road, South, Bhowanipur, Calcutta,
by Prof. B. Gheshal,